Vol. 1 | No. 2 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি

Volume	1
Issue	2
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	December 16, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i2.3
Pages	21-55
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি

মুহম্মদ আবদুল হাই

(পূর্বানুবৃত্তি)

ট বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি

(Retroflex plosive sounds)

বাজারে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতে ট বর্গীয় ধ্বনিকে মূর্ধণ্য ধ্বনি বলে আখ্যাত করা হয়েছে। তাদের সংজ্ঞা অনুসারে এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান মূর্ধা। মানুষ মাত্রেরই শৈশবে মাথার খুলির ওপরের দিকের যে অংশটি তুল্‌তুল্‌ করে এবং শক্ত হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে—এমন কি পরিণত বয়সেও মাথার খুলির অন্যান্য অংশের তুলনায় যে অংশটি অপেক্ষাকৃত কম শক্ত, সেখানটিতে পেরেকজাতীয় কোন শক্ত বস্তু দিয়ে সোজাসুজি বিদ্ধ করলে সেটি তালুর যে অংশকে ভেদ করে ফুটে বেরুবে সাধারণত সেটিকেই আমরা মূর্ধা বলে জানি। অন্যভাবে দেখতে গেলে শক্ত তালুর যেখানে হচ্ছে শেষ আর নরম তালুর হচ্ছে সূচনা—শক্ত ও নরম তালুর সেই সঙ্গমস্থলকেই ধ্বনিবৈজ্ঞানিকেরা মূর্ধা নামে অভিহিত করে থাকেন। যেসব ধ্বনি জিভের সংস্পর্শে মানুষের মুখবিবরের এ অংশ থেকে কিংবা তার সামান্য কিছু আগে শক্ত তালুর মাঝখান থেকে উত্থিত হয়, সে গুলোকেই মূর্ধানিঃসৃত ধ্বনি তথা মূর্ধন্য (cerebral, cacuminal, retroflex) নামে অভিহিত করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এমন কোন বাঙালী আছেন কি যিনি এ ধরণের মূর্ধা থেকে ট বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করেন ?

পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার এ মূর্ধণ্য (?) ধ্বনিগুলোর একটি ইতিহাস আছে। একালের ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ ধ্বনিগুলো 'Proto Dravidian' বা দ্রাবিড়পূর্ব যুগের ধ্বনি। দ্রাবিড় পূর্ব যুগ থেকে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে এ ধ্বনিগুলো 'borrowed'

বা কুন্তক্ষণ ধ্বনি। তবে এ কথা সত্য যে এগুলোকে যে কারণে মূর্ধণ্য ধ্বনি বলা হয় তা দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা তামিল, তেলেগু, মালায়ালম ও কানাড়াতে এবং উত্তর ভারতের আর্যগোত্রভুক্ত মারাঠীতে যে ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে এ উপমহাদেশের অন্য কোনো ভাষাতে তেমন নেই। বাংলাতে তো নেই-ই। তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষীরা একালেও শব্দের মধ্যে এদের অবস্থান অনুসারে শক্ত তালু (hard palate) র মধ্যবর্তী অংশে কিংবা তার কাছাকাছি শক্ত তালুর শেষ এবং পশ্চাত্তালু (soft palate) র সূচনাস্থলে মুচড়ে ধরে ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করে থাকেন। মারাঠী ভাষার সতার উপভাষাতে এ ধ্বনিগুলো যে শক্ত তালুর শেষ প্রান্ত থেকে জাত খাঁটি মূর্ধণ্য ধ্বনি তা গবেষণাগারে কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে।* ফলে তাঁদের মুখনিঃসৃত 'ট', 'ড', 'ড়', প্রভৃতি ধ্বনিগুলোর যে ব্যঞ্জনা শোনা যায় তা স্বচ্ছ ও হালকা নয়, রীতিমতো আড়ষ্ট ও গম্ভীর।

পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণের ব্যাকরণে বর্ণিত ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর যে বর্ণনা উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি তা এ ধ্বনিগুলোর দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণ থেকে কোন অংশে অভিন্ন নয়। পাণিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যে অংশে বাস করতেন সে অঞ্চল জুড়ে সেকালে তাঁর ভাষাতেও ট বর্গীয় ধ্বনির মূর্ধণ্য উচ্চারণ নিশ্চয়ই যথাযথ রক্ষিত হয়েছিল। এখন সেসব অঞ্চলের ভাষায় এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ

---

* "The retroflex flapped articulation in the Marathi word 'Par' may be regarded as entirely in the palatal Zone and the first rapid touch made with the under edge of the tip of the tongue as far back as the post palatal Zone. This articulation is typical for Brahmin speakers of the Satara dialect of Marathi. It does not hold for other so-called "retroflex consonants" of Northern Indian Languages. Measured by this type of retroflexion, such articulations do not function in Hindustani or Urdu. Indeed, it could be maintained that in those languages, 't', initial 'd', and also 'dd' cannot be regarded as having retroflex articulation." Cf. Palatograms illustrating Marathi retroflex articulations by a Satara Brahmin, figs. 4, 5, 6 & 7 of the words 'Par', 'dav', 'tip', 'phara' respectively.—J. R. Firth, "Word Palatograms and Articulations," Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol XII, Pts. 3 & 4,1948.

যেমনই হোক না কেন তাঁর ব্যাকরণ অনুসরণ করে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় যেসব ব্যাকরণ রচিত হয়েছে ধ্বনিবিজ্ঞানের সে রকম চর্চা না থাকার জন্যে অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন সে সব ব্যাকরণে আর রূপায়িত হয়নি—গতানুগতিক পদ্ধতিতে ভাষা নির্বিশেষের ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে অধিকাংশ বৈয়াকরণই তাঁর দেওয়া সংজ্ঞারই অনুকরণ করেছেন। পশ্চিম বাংলার দু একজন ধ্বনিবিদ ছাড়া উভয় বাংলার সব বৈয়াকরণই 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করে ক বর্গের ধ্বনিকে যেমন কণ্ঠ্য বলে অভিহিত করেছেন তেমনি ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান মূর্ধা বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

বাংলায় ট বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণস্থান মূর্ধা যে নয় তা কৃত্রিম তালুর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে যেমন দেখা যায়, তেমনি যে কেউই 'ট' 'ঠ' 'ড', 'ঢ' প্রভৃতি ধ্বনিগুলোর উচ্চারণের জন্য জিভ উঁচিয়ে ধরে আয়নার সাহায্যে দেখতে পারেন কিংবা উপরের তালুর কোন্ অংশকে জিভের কোন্ অংশ স্পর্শ করছে তা জিভ ও তালুর সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকে মনে মনে অনুভবও করতে পারেন। পরীক্ষা যে ভাবেই করা যাক দেখা যাবে ট বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে জিভের ডগা সামান্য একটু পাল্টে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দন্তমূলকে স্পর্শ করে ধরেছে। মূর্ধার দিকে এগিয়ে স্পর্শ করা তো দূরের কথা পশ্চাৎদন্তমূল পর্যন্তও জিভের ডগা এগোয়নি। বাংলার ট বর্গীয় ধ্বনিগুলো দন্তমূলীয়ই (alveolar) ; কিন্তু উচ্চারণ করবার সময়ে জিভের ডগা চ্যাপ্টা হয়ে দন্তমূলের সঙ্গে সেঁটে না গিয়ে কিংবা নীচের পাটি দাঁতকে সটান শায়িত অবস্থায় স্পর্শ না করে একটু দুমড়ে যায়। জিভের ডগার সামান্যতম 'curling' বা দুমড়ানোর জন্যে মুখগহ্বরে ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বাতাস কিছুটা প্রতিবেষ্টিত হয়ে যায়। বায়ুপথের এটুকু প্রতিবেষ্টন বা retroflexionএর জন্যে এ ধ্বনিগুলোর যে ব্যঞ্জনা আমরা পাই তা কোমল মধুর বা স্বচ্ছ ততটা নয় যতটা গম্ভীর, কিন্তু দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ভাষার ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতো নিশ্চয় গুরুভার নয়। এ কারণেই বাংলার এ ধ্বনিগুলোকে cerebral, retroflex, cacuminal বা মূর্ধা না বলে বলা উচিৎ alveolo-retroflex plosive sound-দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত বা দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।

উচ্চারণের স্থান ও উচ্চারণরীতির দিক দিয়ে ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার পর তাদের আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ বিশ্লেষণের আর বেশী কিছু বাকী থাকে না। ক বর্গীয় কিংবা চ বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর মতো এ ধ্বনিগুলোও আপন বর্গীয় গণ্ডীর মধ্যে সমন্বয় ও বৈপরীত্যগুণের দিক থেকে পরস্পর থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। তার ফলে 'ট' ও 'ঠ' এর মধ্যে যে মিল দেখি তা স্বরতন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তাজনিত অর্থাৎ এ দুটো ধ্বনিই অঘোষ, তাদের উভয়েরই অভাব ঘোষতার আর তারা যেখানে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র তা হলো স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা দিয়ে। একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে

ট্ + ই + কা = ি | ট | কা = টিকা
ঠ্ + ই + কা = ি | ঠ | কা = ঠিকা

এ দুটো শব্দের পর পর উচ্চারণ করে। উভয় পার্শ্বের সমস্ত ধ্বনি ঠিক রেখে শুধু 'ট' এর মধ্যেকার প্রাণবায়ুকে বাড়তে না দিয়ে আর 'ঠ' এর বাতাসের চাপকে কমতে না দিয়ে পর পর উচ্চারণ করলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থবোধক দুটো স্বতন্ত্র শব্দ পাবো। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও অক্ষরজ্ঞানহীন বাংলা ভাষাভাষী সকলের কাছেই এ দুটো শব্দের আওয়াজ দুটো স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। তাই 'ট' এর ধ্বনিগত নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত অঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo-retroflex unvoiced unaspirated plosive sound) আর 'ঠ' এর নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত অঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo retroflex unvoiced aspirated plosive sound)

'ট' ও 'ঠ' এর মধ্যে যে মিল ও পার্থক্য 'ড' ও 'ঢ' এর মধ্যেও ঠিক তাই। অর্থাৎ 'ড' ও 'ঢ' দুটোই ঘোষধ্বনি। এখানে তাদের মিল। আর 'ড' স্বল্পপ্রাণ ও 'ঢ' মহাপ্রাণ। এখানে তাদের অমিল।

ড | াক = ডাক্
ঢ | াক = ঢাক্ | এ দুটো শব্দে শ্রোতার মনে যে দুটো স্বতন্ত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে তা নিছক বাতাস নির্গমনের তারতম্যে। একারণেই 'ড' এর ধ্বনিগত নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo retroflex voiced unaspirated plosive sound আর 'ঢ' এর দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত

ঘোষ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি (alveolo retroflex voiced aspirated plosive sound)।

'ট' ও 'ঠ' এবং 'ড' ও 'ঢ'এর মধ্যে যেমন মিল ও পার্থক্য রয়েছে : তেমনি 'ট' ও 'ড' এর মধ্যে মিল আছে স্বল্পপ্রাণতার, পার্থক্য আছে অঘোষতা ও ঘোষতার ; আর 'ঠ' ও 'ঢ' এর মধ্যে মিল আছে মহাপ্রাণতার, কিন্তু পার্থক্য রচিত হয়েছে অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে। ধ্বনিগুণের এ ইতিবাচক ও নেতিবাচক (positive and negative) বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনির মতো 'ট' বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিই এভাবে প্রত্যেকটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

দ্রাবিড়পূর্ব যুগের ধ্বনি কিংবা দ্রাবিড় গোত্রীয় ভাষার মৌলিক ধ্বনি বলেই নাকি অন্যান্য ধ্বনিগোষ্ঠীর তুলনায় ট বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে বাংলার শব্দসংখ্যা অনেক কম আবার শব্দের আদি মধ্য ও অন্তে সমানভাবে এ বর্গের সব ধ্বনির ব্যবহারও হয় না। ধ্বনির ব্যবহার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। বাংলা যে দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ভাষা নয় বাংলা শব্দে দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত এ মূলধ্বনি-গুলোর মিতব্যবহার তার কিছু ইঙ্গিত বহন করে না কি ?

তাড়নজাত ধ্বনি
(Flapped sounds)

বাংলার 'ড়' ও 'ঢ়' চিহ্নিত ধ্বনি দুটো 'ড' ও 'ঢ' এর মতো উপর পাটি দাঁতের গোড়া থেকেই উচ্চারিত হয় কিন্তু পার্থক্য আছে এদের উচ্চারণ-রীতিতে। 'ড' ও 'ঢ' উচ্চারণে জিভের ডগা সেখানে একটু মুচড়ে গিয়ে অনুরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে আমরা যে দুটো ধ্বনি পাই তার ব্যঞ্জনা স্পৃষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত। 'ড়' ও 'ঢ়' উচ্চারণে জিভের ডগা হয়তো বা কিছু মোচড়ও খায় কিন্তু সেটা এত ক্ষীণ যে তা অনুভব করতে পারার আগেই তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ ধ্বনি দুটো উচ্চারণে জিভের ডগার উল্টোপিঠ উপর পাটি দাঁতের গোড়াকে স্পর্শ করতে না করতেই দ্রুত নেমে এসে নীচের পাটি দাঁতের উপরে উছলে পড়ে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে তাড়নজাত। বোয়াল মাছ তার ফিঁচে চালনা করে যেমন জল-

'ড়' ও 'ঢ়'

কেলি করে এ ধ্বনি দুটো উচ্চারণের প্রক্রিয়াটিও তেমনি মানুষের মুখ বিবরে একটা ক্রীড়াশীলতার উদ্রেক করে। শিশু বয়সে জিভের ডগার উল্টোপিঠ অনবরত চালনা করে ড়-ড়-ড়-ড়-ড় ভাবের ধ্বনি তৈরী করতে কে না তৎপর হয়েছে। ধ্বনি-তাত্ত্বিকের কান ও মন নিয়ে এ ধ্বনিটির পরীক্ষা করতে গেলে এখনও এ ধ্বনিটির নড়নক্ষম রূপে বিস্মিত না হয়ে পারি না। বারবার এ ধ্বনি আওড়াতে গেলে এ কারণেই একটা গাঢ় ব্যঞ্জনামধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

'ড়' এবং 'ঢ়' এর উচ্চারণ স্থান এক, রীতিও প্রায় একই। ধ্বনির দিক থেকে দুটোই নিনাদিত বা ঘোষধ্বনি, পার্থক্য তাদের মধ্যে শুধু বাতাসের নির্গমন পদ্ধতিতে। অন্য কথায় 'ড়' স্বল্পপ্রাণ, 'ঢ়' মহাপ্রাণ। 'ড়' এর ধ্বনিতত্ত্বগত নাম ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo flapped sound) আর 'ঢ়' এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি (voiced aspirated alveolo flapped sound)।

যে গুণে অন্যান্য স্পৃষ্টধ্বনি বর্গীয় পর্যায়ে সমন্বিত হয়েছে 'ড়' ও 'ঢ়' এর মধ্যে স্পৃষ্টধ্বনির সেই সমষ্টিগত গুণের অভাব বলেই এ ধ্বনি দুটো বর্গীয় পর্যায়ভুক্ত হয়নি। বর্গীয় ধ্বনির বাইরে একই প্রকৃতির দুটো ধ্বনি যদি সামান্যতম বৈশিষ্ট্যে কোথাও পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা এ দুটো ধ্বনিতেই হয়েছে। সে জন্যে এ দুটো ধ্বনিকে এক রকম অর্ধ বর্গীয় ধ্বনি অথবা দন্তমূলীয় তাড়নজাত বর্গীয় ধ্বনি বলে অভিহিত করা যায়।

পূর্ব বাংলায় 'ড়' ও 'ঢ়' এ দুটো ধ্বনি দেখা যায় না। 'ড়' স্থানে 'র' ব্যবহৃত হয়। কোনভাবেই 'ঢ়' এর ব্যবহার হয় না।

ত বর্গীয় ধ্বনি
(Dental Plosive sounds)

'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ' চিহ্নিত এই চারটি ধ্বনিকে ত-বর্গীয় ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য ধ্বনিবর্গের প্রথম ধ্বনি অনুসারে এখানকার প্রথম ধ্বনিটি দিয়েই এ বর্গেরও নামকরণ করা হয়েছে। এ চারটি ধ্বনির উচ্চারণস্থান এক। উপর পাটি

দাঁতের সামনের বড় দাঁত দুটো (frontal incisor)তে জিভের ডগা বেশ প্রশস্ত ভাবে স্পর্শ করিয়ে এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এ ভাবে সামনের বড় দাঁত দুটোর গায়ে জিভের ডগা চেপে ধরা হয় দেখে একদিকে জিভের উপর পিঠের লম্বমান দুপাশ উঁচু হয়ে উপরের চোয়ালের দুপাটি দাঁতকেই যেমন স্পর্শ করে যায় তেমনি জিভের ডগার উল্টোপিঠের নীচের ভাগ নীচের পাটি দাঁতের উপরিভাগে ছুঁই ছুঁই পর্যায়ে এসে পৌঁছে। দাঁত ও জিভের এতখানি সক্রিয় সংযোগিতায় এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হলেও এদের উচ্চারণের মূল চাপ গিয়ে পড়ে জিভের ডগা আর উপর পাটি দাঁতের বড় দাঁত দুটোতে। এমনিভাবে দাঁত ও জিভের সংস্পর্শে এ ধ্বনি চারটি উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে দন্ত্য (Dental) ধ্বনি বলা হয়।

পরস্পরের মধ্যে স্পৃষ্টতাজনিত মিল থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনিগুলো যে প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ত বর্গের এ ধ্বনি চারটির মধ্যেও সেই একই প্রক্রিয়া কাজ করছে।

'ত' ও 'থ' এর মিল অঘোষতাজনিত আর পার্থক্য স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা দিয়ে। 'দ' ও 'ধ' এর মিলও ঘোষতাজনিত আর পার্থক্য স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা দিয়ে। তেমনি 'ত' ও 'দ' এর মিল স্বল্পপ্রাণতা জনিত ; পার্থক্য অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে আর 'থ' ও 'ধ' এর মিল মহাপ্রাণতাজনিত কিন্তু পার্থক্য অঘোষতা ও ঘোষতা দিয়ে।

ত্ + আল্ = তা | ল
থ্ + আল্ = থা | ল } কিংবা { দ্ + আন্ = দা | ন
ধ্ + আন্ = ধা | ন

এবং ত্ + আন্ = তা | ন
থ্ + আন্ = থা | ন } কিংবা { থ্ + আন্ = থা | ন
ধ্ + আন্ = ধা | ন

প্রভৃতি শব্দ শুনে শ্রোতার মনে যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হয় তা এ ধ্বনিগুলোর পরস্পর মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের এ সামান্যতম বৈপরীত্য গুণের জন্যে।

এবারে ধ্বনিতত্ত্বগত নাম দিয়ে এদেরকে চিহ্নিত করা যাক। উপরে বর্ণিত উচ্চারণের স্থান ও পদ্ধতির দিক থেকে 'ত'কে বলা যাবে অঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্ট ধ্বনি (unvoiced unaspirated Dental plosive sound) 'থ' কে

অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (unvoiced aspirated Dental plosive sound), 'দ'কে ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced unaspirated Dental plosive sound) আর 'ধ'কে ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced aspirated Dental plosive sound)।

প বর্গীয় ধ্বনি
(Bilabial plosive sounds)

বর্গীয় ধ্বনিবর্গের মধ্যে 'প' বর্গীয় ধ্বনিগুলোই বোধহয় সবচেয়ে সহজবোধ্য। তার কারণ এদের উচ্চারণের স্থান এবং রীতি যেমন চক্ষুগ্রাহ্য, অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনি কিংবা বর্গীয় বহির্ভূত অন্যান্য ধ্বনির তেমন নয়। ঠোঁট মুখবিবরের বাইরে অবস্থিত বলে তার ক্রিয়াকলাপ নিজের ছাড়া সবলেরই চোখে পড়ে আর নিজের কাছেও তার অনুভূতির মাত্রা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বায়ুপথ রুদ্ধ করার জন্যে দুই ঠোঁট বন্ধ করা হলে তা যেমন সহজেই চোখে পড়ে তেমনি দুঠোঁটের পেছনে অবরুদ্ধ বাতাসের ধাক্কায় ঠোঁট দুটোর দ্রুত পৃথকীকরণও আমাদের চোখ এড়ায় না। মুখের বাইরের এ প্রত্যঙ্গ দুটোর অবরোধ ও অবরোধমুক্তিজনিত যেসব ধ্বনি উত্থিত হয় সেগুলো মুখবিবরনিঃসৃত ধ্বনিগুলোর তুলনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাদের ব্যঞ্জনা তেমন অনুরণনশীল নয়, নয় তেমনি গাঢ় কি গম্ভীর। 'প', 'ফ', 'ব' ও 'ভ' চিহ্নিত ধ্বনিগুলো দুঠোঁট বন্ধ করে বায়ুপথ যথাক্রমে রুদ্ধ ও মুক্ত করে উচ্চারণ করা হয় বলে এ গুলোকে ওষ্ঠ্য বা প বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনি নামে অভিহিত করা হয়।

অন্যান্য বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতই এ ধ্বনি চারটিতেও একই প্রকারের সমন্বয় ও বৈপরীত্যগুণ এসে একত্রে মিলেছে—তার ফলে তারা একদিকে থেকে যেমন একত্রীভূত অন্যদিক থেকে তেমন যথারীতি পৃথকও।

প্‌ + আল্‌ = প | াল = পাল্‌
ফ্‌ + আল্‌ = ফ | াল = ফাল্‌
ব + আল্‌ = ব | াল = বাল্‌
ভ্‌ + আল = ভ | াল = ভাল্‌

এ চারটি শব্দের পাশাপাশি উচ্চারণ শ্রোতার মনে যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করে তা এদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দিয়ে। 'প' ও 'ফ' য়ে অঘোষতা সমানভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এরা পৃথক হয়েছে যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার জন্যে। আর 'ব' ও 'ভ'য়ে ঘোষতা সমপরিমাণে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ওরা পৃথক হয়েছে যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার জন্যে। ঠিক তেমনি 'প' ও 'ব' স্বল্পপ্রাণ, এখানে তাদের মিল। আর 'প' অঘোষ 'ব' ঘোষ, এখানে তাদের অমিল। আবার 'ফ' ও 'ভ' দুটোই মহাপ্রাণ, সে জন্যে তারা এক প্রকৃতির। কিন্তু 'ফ' অঘোষ, 'ভ' ঘোষ, এ জন্যে তারা পৃথকও।

'প' এর ধ্বনিগত নাম তাই স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি (unaspirated unvoiced bilabial plosive sound), 'ফ' এর মহাপ্রাণ অঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি (aspirated unvoiced bilabial plosive sound) 'ব' এর অল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি (voiced bilabial unaspirated plosive sound) আর 'ভ' এর ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি (voiced aspirated bilabial plosive sound)।

চলিত (standard) সাধু কিংবা কথ্য বাংলায় 'প', 'ফ', 'ব' ও 'ভ' র সব কটি ধ্বনিই স্পৃষ্ট (plosive) ধ্বনি। কিন্তু বাংলার অঞ্চল বিশেষে 'ফ' ও 'ভ' শুধু যে স্পৃষ্টধ্বনি নয় তা নয়, শিসজাত দন্ত্যোষ্ঠ্য (labio-dental fricative) ধ্বনি এবং তার ঘর্ষণও অনেক সময়ে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসে। তা-ছাড়া পূর্ববাংলার নোয়াখালী জেলার অঞ্চল বিশেষে স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে স্পৃষ্টধ্বনি 'প' এর কোন অস্তিত্বও নেই। তারা সেখানে এটির পরিবর্তে দন্ত্যোষ্ঠ্য (labio-dental fricative) শিসজাত ধ্বনিই ব্যবহার করে। এ জন্যে উভয় বাংলার আঞ্চলিক ধ্বনিগুলো সম্পর্কে ব্যাপক বর্ণনাত্মক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি
(Nasal Consonant sounds)

অন্যান্য ভাষাতে যেমন দেখি প্রত্যেকটি হরফের সঙ্গে উক্ত হরফচিহ্নিত ধ্বনির কিংবা প্রত্যেকটি ধ্বনি অনুসারে হরফের অনেক অসঙ্গতি রয়েছে, বাংলাতেও

তেমনি কোনো কোনো হরফের সঙ্গে ধ্বনির কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কয়েকটি ধ্বনি আছে যার কোন প্রতীকযোগ্য হরফ নেই। এ সম্পর্কে বাংলার হরফ সংস্কার পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

আপাতত একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে আমাদের ভাষায় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (nasal consonant phoneme) আছে এ তিনটি যথা ন্, ম্, ঙ্, কিন্তু এদের অতিরিক্ত হরফ দেখি ঞ, ণ্ এবং ং। এছাড়া ন এবং ম এর দুটো মহাপ্রাণরূপ আছে। ধ্বনিতে এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বাংলায় এদের মহাপ্রাণরূপ লিখিতও হয় হ্ন কিংবা হ্ন এবং হ্ম রূপে, কিন্তু বর্ণমালায় স্বতন্ত্রভাবে এ তিনটি হরফের উল্লেখ নেই।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি না করে বাংলার মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যাখ্যায় এবারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। প্রথমত 'ন' চিহ্নিত ধ্বনির কথাই ধরা যাক। এ হরফটির প্রচলিত নাম 'দন্ত্য ন।' বাঙালী সন্তানের যেদিন অক্ষর পরিচয় হয় সেদিন সে এটির নাম শেখে 'দন্ত্য ন'—তারপর বাকী জীবন ধরে এটির এ নামই সে আওড়ায়; আবার তার বংশাবলীর কাছে এ হরফটির এ নামই সে রেখে যায়। এর ফলে বাংলাভাষাভাষীদের কাছে এ হরফটির 'দন্ত্য ন' নামই অক্ষয় হয়ে গেছে। বাজারে প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণেও এর এ ছাড়া কোনো দ্বিতীয় নাম আমাদের চোখে পড়ে কি? অথচ দু একজন ধ্বনিবিদ ছাড়া তথাকথিত বৈয়াকরণদের কেউ কোন দিন উচ্চারণের স্থানের সাহায্যে এটির উচ্চারণ যাচাই করে এর নামকরণ করবার প্রয়াস পেলেন না!

'দন্ত্য না দন্তমূলীয় ন?'

খেয়াল করলেই দেখা যাবে 'ন' এর উচ্চারণের জন্যে জিভের ডগা উপরপাটি দাঁতের গোড়াতেই উত্তোলিত হয়। 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' উচ্চারণে জিভের ডগাকে যেমনভাবে উপরের পাটি দাঁতের প্রধানত সামনের বড় দুটির গায়ে চেপে ধরা হয় 'ন' উচ্চারণে জিভের ডগাকে তেমনিভাবে দাঁতের সঙ্গে লাগানো হয় না, হয় উপরের বড় দু-দাঁতের পেছনের মাড়ি যেখানে একটু উত্তল (convex)

হয়ে উঠেছে ঠিক সেখানটিতে। সেজন্যে 'ন'কে দন্ত্য বলা চলে না, বলা উচিত দন্তমূলীয় (alveolar)। একথা যে কত সত্য তা দেখা যাবে কৃত্রিম তালুর সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে, 'ন' উচ্চারণে জিভের ডগা যেখানে উত্তোলিত হয় সেখানে জিভের ডগাকে ও অবস্থায় রেখে আয়না দিয়ে দেখে কিংবা নিজে মনে মনে একটু অনুভব করলেও। 'ন' কে কোন শব্দের মধ্যে না ফেলে এমনি উচ্চারণ করে, কিংবা অসংযুক্ত 'ন' কে শব্দের গোড়াতে, মধ্যে কিংবা শেষে ফেলে (যেমন নাক, কান, নানা, নানান্ প্রভৃতি শব্দে) উচ্চারণ করে পরীক্ষা করলেই তার উচ্চারণগত অবস্থান ভালো বোঝা যাবে। উচ্চারণের স্থান বিচারে 'ন' এ জন্যই 'দন্তমূলীয়', তথাকথিত 'দন্ত্য' নয়। 'ন' এর দন্ত্য উচ্চারণ পাওয়া যায় শব্দমধ্যবর্তী ত বর্গীয় ধ্বনি চারিটির পূর্ব্বে—দন্ত, পন্থা, মন্দা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে, অন্যত্র নয়। আবার একই শব্দের মধ্যে 'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ' ধ্বনি কয়টির পূর্বে 'ন' এর উচ্চারণ দন্ত্য হলেও বাক্যের মধ্যবর্তী শব্দশেষের 'ন' এর পরবর্তী শব্দ 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ' দিয়ে শুরু করলে সেখানে দন্ত্য না হয়ে দন্তমূলীয়ই হয়ে থাকে। যেমন 'খান্দানী ঘর', 'মন্দ মন্দ বহে বায়ু' প্রভৃতি বাক্যে 'দ' এর পূর্বেকার শব্দমধ্যবর্তী 'ন' দন্ত্যই কিন্তু 'কিছু খান্ দান্ তারপর উঠ্বেন' কিংবা 'পড়াশুনায় মন্ দাও' প্রভৃতি বাক্যে ত বর্গীয় ধ্বনি পরে থাকলেও 'খান' এবং 'মন' শব্দের 'ন' উচ্চারণ আবার দন্তমূলীয়ই, দন্ত্য নয়। সুতরাং বাংলার 'ন' ধ্বনিটি যে আমাদের দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (তথা মূল Phoneme) সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাশ্চাত্য ধ্বনিবিদ Daniel Jones ধ্বনিমূল বা Phoneme এর এ সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন : 'A phoneme is a family of sounds in a given language which are related in character and are used in such a way that no one member ever occurs in a word in the same phonetic context as any other member.' *

এ সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে কোনো একটি ভাষার ধ্বনির সাহায্যেই মূলধ্বনির নির্ণয় করতে হবে। এক ভাষার একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ভাষার সেই ধ্বনিটির সাদৃশ্য থাকলেও

Phoneme

* Daniel Jones : The Phoneme : its nature and use : 1950 p. 10.

মূলধ্বনি নির্ণয়ে এ সাদৃশ্য বিচার পরিত্যাগ করতে হবে। মূলধ্বনিটি একটি পরিবার-ভুক্ত হবে। উক্ত পরিবারের অর্থাৎ উক্ত মূলধ্বনিকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি সদস্য থাকবে। একই মূলধ্বনির সদস্য হওয়ার জন্যে তাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চারণের দিক থেকে অনুরণন গত মিল থাকবে কিন্তু ভাষায় ব্যবহারের বেলায় শব্দের মধ্যে একটি সদস্য যেখানে ব্যবহৃত হবে অন্য সদস্যটি কিছুতেই সেখানে ব্যবহৃত হবে না। একটি ভাষার একটি মূলধ্বনির পরিবারভুক্ত প্রত্যেকটি সদস্যের এ সীমিত ব্যবহারই তাদেরকে মূলধ্বনির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া থেকে বিরত করে।

আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে 'ন' ই বাংলার দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি এবং 'দন্ত্য ন' তার পরিবারভুক্ত সদস্য। বাংলা হরফে 'দন্ত্য ন'কে স্বতন্ত্রভাবে রূপায়িত করার কোন অবলম্বন না থাকলেও শব্দ মধ্যবর্তী ত বর্গের ধ্বনিগুলোর পূর্বে বাঙালী মাত্রই একে স্বাভাবিকভাবে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারণ করে। অবশ্য বক্তার যদি দাঁত পড়ে গিয়ে থাকে তবে তার কথা স্বতন্ত্র। আন্তর্জাতিক ফোনেটিক স্ক্রিপ্ট এ 'দন্ত্য ন'কে '$\underset{+}{n}$' এভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দন্তমূলীয় মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি (Phoneme)র দন্ত্য সদস্য ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরও দুটি সদস্য আছে। একটি 'ঞ' এবং আর একটি 'ণ'।

বর্ণমালায় ব্যঞ্জনধ্বনির পর্যায়ে 'ঞ' অবস্থিত। বাংলা বানানে আমরা 'মিঞা', 'বঞ্চনা', 'লাঞ্ছনা', 'ব্যঞ্জন', 'ঝঞ্ঝা' প্রভৃতি শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি নির্বিশেষে এ হরফটিকে ব্যবহার করার প্রয়াস পাই। বলা বাহুল্য 'ঞ' বলে কোনো স্বরধ্বনি নেই। আমরা লিখি 'মিঞা' পড়ি 'মিআঁ' অথবা মিঁআ। এখানে 'ঞ' তে সন্নিহিত যে স্বরধ্বনিটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য তা হলো 'আঁ' কিংবা 'আ'। সুতরাং ঞ দিয়ে 'মিঁআ' শব্দটি লিখলেও স্বরধ্বনি সম্বন্ধে 'ঞ'র কোন প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশস্তদন্তমূলীয়
বা
দন্তমূলীয় তালব্য
ন (ঞ)

'চ', 'ছ', 'জ' ও 'ঝ' যে প্রশস্ত দন্তমূলীয় (palato alveolar) তথা dorsal ধ্বনি এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে জিভের ডগাসংলগ্ন পাতা চ্যাপ্টা হয়ে দন্তমূল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-

গুলোকে ছুঁয়ে যায়। শব্দমধ্যবর্তী 'চ', 'ছ', 'জ' ও 'ঝ' ধ্বনির আগে 'ন' এলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চ্যাপ্টা হয়ে উচ্চারিত হয়। 'ন' এর চওড়াভাবের তথা প্রশস্ত উচ্চারণ শব্দমধ্যবর্তী এ কটি ধ্বনির পূর্বে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। 'ন' এর এ চ্যাপ্টা উচ্চারণ শব্দমধ্যে এ ভাবে সীমিত হয় দেখে মূল দন্তমূলীয় phoneme 'ন' এর এও এক সদস্য (member)। আমেরিকার ধ্বনিতাত্ত্বিকদের কাছে মূল phonemeএর সদস্য (member) হিসেবে এটি allophone (অন্তরধ্বনি বা সহধ্বনি) নামে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে।

শব্দমধ্যবর্তী 'চ' বর্গীয় ধ্বনির আগে আমরা 'ঞ' লিখি বা না লিখি শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করতে হলেই দন্তমূলীয় 'ন' এর উচ্চারণ 'ঞ' জাতীয় প্রশস্ত দন্তমূলীয়ই হবে। কিন্তু বাক্যমধ্যবর্তী শব্দ যেখানে 'ন' দিয়ে শেষ হয় আর পরবর্তী শব্দ যেখানে 'চ' বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় সেখানে 'ন' এর উচ্চারণ দন্তমূলীয়ই, প্রশস্ত দন্তমূলীয় নয়। 'মাঞ্জা', 'খাঞ্চা', 'ঝঞ্ঝা' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে 'প্রাণ্ যায় তবু মান্ যায় না', 'খুন্ চাই', 'ঝন্ঝন্' প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশের প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনির পূর্ববর্তী 'ন' উচ্চারণের বৈশিষ্ট আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে (এ উদাহরণগুলোর 'যায়' শব্দের 'য' উচ্চারণ প্রশস্ত দন্তমূলীয় তথা 'জ'ই)।

বাংলার 'ট' বর্গীয় ধ্বনি 'ট', 'ঠ', 'ড' ও 'ঢ' কে দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য (alveolo-retroflex) বলা হয়েছে। উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে এরা দন্তমূলীয় কিন্তু রীতির দিক থেকে এ ধ্বনিগুলোতে মূর্ধণ্যীকৃত ব্যঞ্জনা জড়িত আছে। এ ব্যঞ্জনার উদ্ভব হয় এদের উচ্চারণে দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা কিছুটা দুমড়ে যায় বলে। 'ট', 'ঠ', 'ড' ও 'ঢ' এর আগে শব্দমধ্যে 'ন' ব্যবহৃত হলেই পরবর্তী ধ্বনির জন্য উক্ত 'ন' উচ্চারণে জিভ আগে থেকেই মুচড়ে যায়। সেজন্যে তখনকার 'ন' উচ্চারণেও আমরা তার সহজাত (homorganic) অনুরণন শুনতে পাই। 'কণ্টক', 'কাণ্ঠা', 'খণ্ডন', 'ঝাণ্ডা' প্রভৃতি শব্দমধ্যবর্তী ('ন' + 'ট', 'ঠ', 'ড') এর সন্ধিজাত উচ্চারণ একারণেই মূর্ধণ্যীকৃত। 'ন' এর এ মূর্ধণ্যীকৃত উচ্চারণ ভাষার অন্যত্র শোনাতো দূরের কথা বাক্য কি বাক্যাংশে শব্দ

মূর্ধণ্য 'ণ' ?

যেখানে 'ন' দিয়ে শেষ হচ্ছে এবং তার পরবর্তী শব্দ যেখানে 'ট' বর্গীয় ধ্বনি দিয়ে শুরু হচ্ছে সেখানেও আমরা শুনতে পাই না। 'কণ্টক', 'বণ্টন', 'কাণ্ঠা', 'পাণ্ডা' প্রভৃতি শব্দের 'ন' এর সঙ্গে 'ওর কান্‌টা টেনে দাও', 'কান্‌টানা', 'পান্‌টা দাও', 'কোন্‌ ঠাকুর?' 'কান্‌ ঢাকো' প্রভৃতি বাক্য ও বাক্যাংশের 'ট' বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্ববর্তী 'ন'র তুলনা করলেই আমার কথার সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। এ উদাহরণ গুলোর শব্দমধ্যবর্তী 'ন' উচ্চারণ মূর্ধণ্যীকৃত কিন্তু শব্দপ্রান্তবর্তী 'ন' এর উচ্চারণ নিছক দন্তমূলীয়ই। 'ন' এর মূর্ধণ্যীকৃত উচ্চারণ শব্দমধ্যবর্তী 'ট' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ছাড়া অন্যত্র যেমন কোথাও শোনা যায় না তেমনি প্রচলিত বাংলা বানানে শব্দের শেষে কি মধ্যে অসংযুক্ত অবস্থায় 'ণ' ব্যবহৃত হলেও 'ণ' দিয়ে কোথাও বাংলা শব্দ শুরু হয় না। বানান যেখানে যেমনই হোক অসংযুক্ত 'ণ' উচ্চারণ বাংলাতে খাঁটি দন্তমূলীয়ই। মূর্ধণ্য 'ণ' এর উচ্চারণগত এ সীমিত ব্যবহারই একে মূলধ্বনি (phoneme) থেকে অপসারিত করে দন্তমূলীয় 'ন' এর সদস্য বা allophone রূপে পরিগণিত করেছে।

দন্তমূলীয় 'ন' এর দন্ত্য সদস্যটির কোনো প্রতিলিপি বাংলা হরফে নেই। শব্দমধ্যবর্তী ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূলধ্বনিগত দন্তমূলীয় প্রতিলিপিটি ব্যবহার করেও আমরা যদি দন্ত্য উচ্চারণ করি বা করতে পারি তাহলে শব্দমধ্যবর্তী 'চ' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ঞ' কিংবা 'ট' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূর্ধণ্য 'ণ' ব্যবহার করার কোনো ধ্বনিগত সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ অনুরূপ ক্ষেত্রে আমরা যে প্রতীকই ব্যবহার করি না কেন পরবর্তী ধ্বনির অনুষঙ্গগত (homorganic) উচ্চারণই করবো। বাংলা হরফ ধ্বনিমূলক (phonetic) বটে, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিমূলক (absolute phonetic) ততটা নয়, যতটা মূলধ্বনিমূলক বা phonemic। বাংলার অন্যান্য ধ্বনির এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ যদি আমাদের প্রচলিত হরফগুলোতে প্রতিবিম্বিত না হয় এবং তাতে বাংলা ভাষাভাষীদের কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে ধ্বনিগত দিক থেকে 'ঞ' এবং 'ণ'কে আমরা সহজেই অপসারিত করতে পারি।

এ পর্যন্ত আমি যে আলোচনা করেছি তাতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলার 'ন' জাতীয় মূলধ্বনি তথা phoneme একটিই এবং সেটি দন্তমূলীয় 'ন'। বাকীগুলো

তথা প্রতিলিপিহীন দন্ত্য 'ন', হরফের সাহায্যে প্রতিবিম্বিত প্রশস্ত দন্তমূলীয় তথা দন্তমূলীয় তালব্য 'ঞ' এবং দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য 'ণ' তার পরিবারভুক্ত সদস্য তথা member কিংবা মূলধ্বনি বা phoneme এর সহধ্বনি বা allophone।

উপর পাটি দাঁতের মাড়ির যে অংশটুকু উত্তল (convex) সেখানে জিভের ডগাকে স্পর্শ করিয়ে এ 'ন' এর উচ্চারণ করা হয়। জিভের ডগা ও দাঁতের মাড়ি পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় থাকাকালেই নরম তালু কিঞ্চিৎ ঝুলে পড়ে। ফলে নাসাপথ আলগা হয়ে যায় আর ফুসফুসচালিত বাতাস তখন মুখ দিয়ে না বেরিয়ে নাক দিয়ে বেরোয়। একারণে মুখ না খুলে উচ্চারক দুটোর সংলগ্ন অবস্থায় একে একদিকে যেমন যথেচ্ছ প্রলম্বিত করা যায় তেমনি নাসাপথের কাঠামো দিয়ে বাতাস নিঃসৃত হয় দেখে অন্যান্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো এ ধ্বনিটির ব্যঞ্জনা নূপুরগুঞ্জনময়—মধুরও। ধ্বনিটি ঘোষ বা নিনাদিতও বটে। 'ন' এর ধ্বনিগত নাম তাই দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-nasal consonant sound)।

বর্গীয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থটা যেমন মহাপ্রাণ এবং এ মহাপ্রাণতাই যেমন যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয়টি থেকে তাদের পৃথক করে দিয়েছে তেমনি 'ন' এরও একটি মহাপ্রাণ রূপ আছে। বাংলার বর্গীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতো এর ব্যবহার এত ব্যাপক না হলেও কিংবা অর্থগত দিক থেকে এর মহাপ্রাণতা স্বল্পপ্রাণ 'ন' ধ্বনি থেকে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি না করলেও 'চিহ্ন', 'অপরাহ্ণ' 'আহ্নিক' প্রভৃতি কয়েকটি তৎসম শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত যে ধ্বনিটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তা 'হ' এবং 'ন' এর যুক্তধ্বনি নয়। হ, ন কিংবা ণ এর সঙ্গে সংযুক্তরূপে এতকাল বাংলা লিপিতে লিখিত হয়ে আসছে দেখে আমাদের মনে এ যুক্তধ্বনিটি সম্পর্কে যে সংস্কার জন্মে গেছে তা 'হ'য়ে 'ন' ফলার বা উভয়ের যোগের। ফলে নানাভাবে ওদুটোর যোগজনিত উচ্চারণবিকৃতি ঘটেছে। মাঝে মাঝে 'চিহ্ন' কিংবা 'অপরাহ্ণে'র যে উচ্চারণ শুনি তা মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়। 'চিহ্ন' বিকৃত হয়ে উচ্চারিত হয় 'চিহ্‌ন' কিংবা 'চিন্‌হ' রূপে আর 'অপরাহ্ণ'ও উচ্চারিত হয় 'অপরাহ্‌ন' কিংবা 'অপরান্‌হ' রূপে। বাংলা দেশের অঞ্চলবিশেষে এর একটা সমাধান হয়েছে। সেখানে এর মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে স্বল্পপ্রাণ 'ন'ই এ রকম শব্দগুলোতে দ্বিত্ব লাভ করেছে। তাই তাদের

মুখে 'চিহ্ন' হয় 'চিন্ন', 'আহ্নিক' হয় 'আন্নিক'। এ একরকম মন্দের ভালো।

হ্ন, হ্ণ

কিন্তু বিকৃত না করে যথার্থভাবে এর উচ্চারণ করতে পারলে দেখা যাবে 'হ্ন' কিংবা 'হ্ণ' আসলে 'ন' এরই মহাপ্রাণ রূপ। 'খ' কি 'ঘ' প্রভৃতি ধ্বনি যেমন 'ক' ও 'গ' এর মহাপ্রাণ রূপ এবং নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তেমনি 'হ্ন', 'হ্ণ' ও আসলে 'ন্‌হ'ই এবং one breath কিংবা one effort articulation। 'ন্‌হ' (nh) এর ধ্বনিগত নাম তাই ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনি (voiced aspirated alveolo-nasal consonant sound)।

সখ্য (স'ক্‌খো), সাধ্য (সাদ্‌ধো) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে যেমন 'খ' 'ধ' প্রভৃতি ধ্বনির প্রথমাংশ স্বল্পপ্রাণরূপে গঠিত ও দীর্ঘত্বপ্রাপ্ত হয় অথচ মুক্ত হয় না আর দ্বিতীয়াংশ কেবলমাত্র মহাপ্রাণরূপে মুক্তই হয় গঠিত হয় না, 'চিহ্ন' (চিনন্‌হ) 'অপরাহ্ন' (অপরান্‌ন্‌হ) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণেও তেমনি এর প্রথমাংশ স্বল্পপ্রাণ রূপে দীর্ঘত্ব লাভ করে কিন্তু মুক্ত হয় না আর দ্বিতীয়াংশ নূতন করে গঠিতই হয় না, পূর্বাংশের দীর্ঘত্বপ্রাপ্ত ধ্বনিটিই মহাপ্রাণরূপে মুক্তি লাভ করে।

'ম' বাংলার দ্বিতীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। এ মূলধ্বনিটি 'ন' এর মতো কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। দু ঠোঁটের সাহায্যে এর উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয় দেখে এ ধ্বনিটির সঙ্গে একটা সহজ স্বচ্ছতা জড়িয়ে রয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত ভাষার মাতৃত্ববোধক শব্দের

ম

মূল উৎস বলেই বোধহয় 'ম' বাংলারও সহজতম ধ্বনি। 'ম' ধ্বনি গঠন-কালে দুঠোঁট পরস্পর মিলিত হতে না হতেই ঠোঁটের অমুক্ত অবস্থায় নীচের চোয়াল কিছুটা নেমে আসে। ফলে মুখের ভেতরে গভীরতম গহ্বরের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথও হয় সম্পূর্ণ আলগা। এভাবে মুক্ত নাসাপথ দিয়ে ফুস্‌ফুস্‌ চালিত বাতাস বের হতে গিয়ে মুখের ভেতরে যে গম্ভীর মনোহর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে বাংলার 'ম' নামক হরফটিতে আমরা সেই ধ্বনিটি পাই। 'ম' ধ্বনি গঠনে মুখবিবর সবচেয়ে প্রশস্ত হয়, ফলে সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে তার অনুরণন ধ্বনিত হয় দেখে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্য 'ম' এর মতো এমন স্নিগ্ধ গম্ভীর ও প্রাণময় ধ্বনি আর পাওয়া যায় না।

এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কেঁপে যায়। এ জন্যে এটি নিনাদিত বা ঘোষধ্বনিও। অন্যান্য নাসিক্য ধ্বনির মত 'ম'ও প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি। ঠোঁট দুটো বন্ধ করে ফুস্‌ফুস্‌চালিত বাতাসকে সহজভাবে চলতে দিয়ে 'ম' ধ্বনির মধুর মাহাত্ম্য ও চমৎকারিত্বের স্বাদ পাওয়া যায় এবং এ ধ্বনিটিকে যতই প্রলম্বিত করা যায় গানের সুরের রেশের মতো এর অনুরণন ততই যেন ঝঙ্কৃত হতে থাকে। আবার ঘন ঘন ঠোঁট দুটো খুলে ও লাগিয়ে একে প্রলম্বিত করলে এর গুরুগম্ভীর ধ্বনিমাহাত্ম্যে প্রাণ বিভোর হয়ে আসে। প্রত্যেকটি ধ্বনিরই যে স্বাদ ও মাধুর্য আছে, ধ্বনিতাত্ত্বিকের মন ও কান দিয়ে অনুশীলন করলে প্রাণ ভরেই তা উপলব্ধি করা যায়। তখন 'ম' ধ্বনির মাধুরীতে মন আপনা থেকেই মুগ্ধ হয়ে আসে।

'ম'র ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced unaspirated bilabial nasal consonant sound)। ওষ্ঠ্য নাসিক্য মূল ব্যঞ্জনধ্বনি 'ম'এর 'ন'এর মতো আর কোনো সদস্য নেই। 'ম' একাই একশো।

মহাপ্রাণ 'ন্‌হ' (nh) এর মতো 'ম' এরও একটি মহাপ্রাণ রূপ আছে 'হ্ম'। 'ন্‌হ' (nh) এর মতোই এর ব্যবহারও সীমিত। স্বল্পপ্রাণ 'ম' এর সঙ্গে মহাপ্রাণের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে বর্গীয় ধ্বনিগুলোর মতো এ স্বতন্ত্র অর্থবোধক

হ্ম। শব্দেরও সৃষ্টি করে না। এর ব্যবহার দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে (intervocalic) 'ব্রহ্মা', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দেই পাওয়া যায়। 'ন্‌হ'এর মতো 'হ্ম'এর উচ্চারণও একরকম বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আমরা এরকম শব্দের উচ্চারণ শুনি হয় 'ব্রহ্‌মা', 'ব্রহ্‌ম' কিংবা 'ব্রম্‌হা', 'ব্রম্‌হ' কিংবা 'ব্রম্মা', 'ব্রম্ম'। কিন্তু এর খাঁটি উচ্চারণ করলে কি শুনলে দেখা যাবে এটি 'হ্‌ + ম'এর কিংবা 'ম্‌ + হ' এর ফলাজাত যৌগিক উচ্চারণ নয়,—'খ', 'ঘ', 'থ', 'ধ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতোই নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উত্থিত উচ্চারণ (one effort articulation)। সখ্য (সোক্‌খো), পথ্য (পোত্‌থো), বধ্য (বদ্‌ধো) প্রভৃতি শব্দে যেমন শেষের ধ্বনিটির প্রথম অংশ গঠিত হয় অথচ মুক্ত হয় না, আর শেষাংশ শুধু মুক্তই হয় গঠিত হয় না, অন্যকথায় শেষাংশ হয় ক্ষণস্থায়ী, তেমনি 'চিহ্ন', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দেও 'ন্‌হ' এবং 'হ্ম' ধ্বনির প্রথমাংশ প্রলম্বিত হয়ে শ্রোতার কানে দ্বিত্ববোধক আভাস এনে দেয় আর শেষাংশ নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে সজোরে

নির্গত মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। 'ন্হ' এর ধ্বনিগত নাম যেমন ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি তেমনি 'হ্ম'এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (voiced aspirated bilabial nasal consonant sound)।

আমরা ছোটবেলা থেকে 'ঙ' হরফটির নাম শিখে আসছি "উঁয়োঁ"। ধ্বনিটিও যদি এ নাম অনুসারে উঁয়োঁ হয় তাহলে আর যাহোক স্পর্শহীনতার জন্যে এটি যে ব্যঞ্জনধ্বনি হবে না আশা করি তা সহজেই বোধগম্য হবে। এ হরফটির মধ্যে যে ধ্বনিটি নিহিত আছে তা হলো 'ঙ্' (অঙ্)। শব্দবহির্ভূত অবস্থার 'অঙ্' রূপে লিখলেও এর যথাযথ উচ্চারণ ধরা পড়বে না। এ ধ্বনিটিকে লক্ষ্য করে জিভের পশ্চাৎভাগকে নরমতালুর পশ্চাৎভাগের সঙ্গে উঁচিয়ে ধরতে গেলেই নরম তালু স্বভাবতই কিছুটা নেমে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথও (nasopharynx) সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এ পরিবেশে ফুসফুসচালিত বাতাস এর পেছনে এসে আবদ্ধ অবস্থায় না থেকে নাসাপথে মুক্ত হয়ে গিয়ে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে সেটিই হচ্ছে ঘোষ বা নিনাদিত পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ঙ্'। ইংরেজীতে এর ধ্বনিগত নাম voiced velar nasal consonant sound। রঙ্, ঢঙ্ সঙ্ প্রভৃতি শব্দে এ ধ্বনিটির নির্মল ব্যঞ্জনা এবং যথার্থ পরিচয় আমরা পাই। 'ঙ' মূলধ্বনি (phoneme) এর অন্য কোনো সদস্য নেই। এ ব্যাপারে সে একক মহারাজ।

দন্তমূলীয় এবং ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো পশ্চাত্তালুজাত এ নাসিক্য ধ্বনিটির ব্যবহার অবাধগতিসম্পন্ন নয়। 'ন' ও 'ম' যেখানে শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে অবাধে বিচরণ করে 'ঙ্' সেখানে শুধুমাত্র শব্দের মধ্যে (যেমন সাঙাত, বাঙাল, বাঙ্লা,) এবং অন্ত্যেই (যেমন রঙ্, ঢঙ্, রাঙ্) ব্যবহৃত হয়।

বাংলা বর্ণমালায় প্রত্যেকটি বর্গীয় ধ্বনির শেষে উক্ত বর্গীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ঙ' 'ঞ' 'ণ' 'ন' 'ম' এর উল্লেখ আছে। পাণিনি প্রমুখ ধ্বনিবিদও 'ক' থেকে 'ম' অবধি এ পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখিয়েছি বাংলার নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মধ্যে স্পর্শতাগুণ যে নেই তা নয়। তা থাকা সত্ত্বেও স্পর্শধ্বনির মতো মুখ এদের মুক্তির পথ নয়। মুখবিবরে কিংবা

মুখের বাইরে এদের উচ্চারক দুটোকে বন্ধ রেখেই নাসাপথে বাতাস বের করে দেওয়া যায় বলেই এরা সব কটিই প্রলম্বিত ধ্বনি। তবু বর্গীয় স্পর্শধ্বনিগুলোর সঙ্গে তাদের আপনাপন নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিকে যুক্ত করে তাঁরা একদিক থেকে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। এতে ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যে কত গভীর এবং অন্তর দৃষ্টি ও ধ্বনি বিশ্লেষণ ক্ষমতা যে কত সুদূরপ্রসারী তা সহজেই অনুমিত হয়।

প্রত্যেক বর্গীয় ধ্বনির পরে উক্ত বর্গের নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিটি যুক্ত হলে তার সহজাত (homorganic) উচ্চারণ হয়। বাংলায় আমরা কঙ্‌ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্‌গ সঙ্‌ঘ, চঞ্চু, বাঞ্ছা, সঞ্চয়, ঝঞ্ঝা, কন্টক, কাণ্ঠা, ডাণ্ডা, কিন্তু, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা, কম্প, গুম্ফ, গুম্বজ, গম্ভীর, প্রভৃতি শব্দে এ সত্য যথাযথ উপলব্ধি করি। 'চ' বর্গীয় এবং 'ট' বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্তমূলীয় 'ন' এর উক্ত ধ্বনিগুলোর সহজাত তথা স্বপ্রত্যঙ্গীভূত উচ্চারণ 'ঞ' এবং 'ণ' কে 'ন' মূলধবনির স্বতন্ত্র সদস্যরূপে গণ্য করেছে। 'ম' এবং 'ঙ' মূল ধ্বনির এ ধরণের উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র সদস্য না থাকলেও 'প' বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ম' এর সহজাত উচ্চারণ এবং 'ক' বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ঙ' এরও সহজাত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ঙ' সঙীণ, রাঙা, সাঙাত, বাঙাল প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির (intervocalic) মাঝখানে ব্যবহৃত হওয়ায় তার মধ্যেকার স্পর্শতাগুণ তেমন মূর্ত হয়ে ওঠে না। কিন্তু কঙ্কণ, সঙ্খ, গঙ্গা, সঙ্ঘ, সঙ্গে, বাঙ্গাল প্রভৃতি শব্দে পরবর্তী ধ্বনিগুলো স্পৃষ্ট বলেই ফটকার মতো আওয়াজ করে তাদের উচ্চারকেরা মুক্ত হয়ে যাবার সময় 'ঙ্'র স্পর্শতাগুণকেও সুস্পষ্ট করে দিয়ে যায়।

'ন' এবং 'ম'এর যেমন মহাপ্রাণ রূপ আছে 'ঙ'র তেমন কোনো মহাপ্রাণ রূপ নেই।

বাংলা বর্ণমালায় অনুস্বার (ং) বলে একটি হরফের পরিচয় আমরা পাই। রং, ঢং, বাংলা, বংশ, হংস, কংস, ইত্যাদি শব্দে এর বহুল ব্যবহারও আমরা দেখি।

অনুস্বার প্রসঙ্গ

কিন্তু ধ্বনিগত দিক থেকে 'ঙ' র অতিরিক্ত এর কোন ব্যঞ্জনা কি আমরা শুনতে পাই? বাংলা ধ্বনিতে 'ঙ' এবং অনুস্বার 'ং' সম্পূর্ণ অভিন্ন। বাংলাদেশের বাইরে দেবনাগরী অক্ষরে গুজরাটী ও মারাঠীতে এবং অধুনা হিন্দীতেও অনুস্বারের স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনি নেই। তা পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির

নাসিক্য ধ্বনিজ্ঞাপক একটি চিহ্ন বা Prosodic mark মাত্র। এসব ভাষায় সংকল্প, সংগীত, সংবাদ, সংজ্ঞয়, সংচয়, পংডিত, কিংনর, চংদ্র প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত অনুস্বার বাংলার মতো সর্বত্র 'ঙ'এর প্রতীক নয়। 'সংকল্প ও 'সংগীত' এ তথা 'ক' বর্গীয় সমস্ত ধ্বনির পূর্বে 'ঙ'র মতোই; কিন্তু 'চ' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে এর উচ্চারণ 'ঞ'র মতো। 'ট' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ণ' এর মতো, 'ত' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ন' এর সঙ্গে এ অভিন্ন এবং 'প' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে এ 'ম' এর প্রতিনিধি। তাই এসব ভাষায় 'সংবাদ' এর উচ্চারণ 'সম্বাদ'। 'কিংবা'র উচ্চারণ 'কিম্বা'। 'সংজয়' এর উচ্চারণ 'সঞ্জয়'। 'পংডিত' উচ্চারিত হয় 'পণ্ডিত' রূপে। 'কিংনর' হয় কিন্নর' আর 'চংদ্র'ও 'চন্দ্র' রূপে উচ্চারিত হয়।

বাংলায় অনুস্বার 'ং' এবং 'ঙ' ধ্বনিগত দিক থেকে অভিন্ন বলে বাংলার হরফ সংস্কারের সময় অনুস্বারকে বাদ দিয়ে পশ্চাত্তালুজাত 'ক' বর্গীয় স্পৃষ্টধ্বনির সহগামী নাসিক্যধ্বনির প্রতীক 'ঙ' রাখলেই উভয়ের কাজ চলতে পারে।

পার্শ্বিক ধ্বনি
(Lateral sound)

ইতিপূর্বে পার্শ্বিক ধ্বনির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। বাংলায় পার্শ্বজাত মূলধ্বনি (Phoneme) রয়েছে একটিই। 'ল' হরফটি দিয়ে এ ধ্বনিটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত জিভের ডগা এবং দাঁতের গোড়াই এ ধ্বনিটির উচ্চারক। কিন্তু জিভের ডগা সংলগ্ন পাতাকে এমনভাবে উপর পাটি দাঁতের বড় দু দাঁতের মাঝ বরাবর চেপে ধরা হয় যার ফলে উপরের দুপাশের চোয়াল ও জিভের মাঝখানে বেশ ফাঁক থাকে। তাই উচ্চারক দুটো আলাদা হবার আগেই ফুস্‌ফুস্‌তাড়িত বাতাস জিভ ও চোয়ালের পার্শ্ববর্তী এক কিংবা দুদিকের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যায়। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপনও লাগে। সে জন্যে ধ্বনিটি (voiced) ব্যঞ্জনাময়ও। এ ধ্বনিটির মধ্যেও স্পর্শতাগুণ আছে। কিন্তু স্পর্শধ্বনিগুলোর মতো তা স্বল্পস্থায়ী নয়। উচ্চারক দুটোকে পৃথক হতে না দিয়ে জিভ ও চোয়ালের পার্শ্বোদ্ভূত ফাঁক দিয়ে বাতাস বের করে দিয়ে এ ধ্বনিটিকে ইচ্ছামতো প্রলম্বিত করা হয়। সে জন্যে নাসিক্য ধ্বনি-

গুলোর মতো একে প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি বলা যেতে পারে। বাংলা বর্ণমালায় স্পর্শ ও উষ্মবর্ণের অন্তঃ বা মধ্যে অবস্থিত বলে আমাদের প্রাচীন ধ্বনি-বিদগণ য, র, ল, ব-কে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে স্বভাবতই 'ল'ও অন্তঃস্থ বর্ণ। আমরা মূলত ধ্বনির মূল্য নির্ণয় করছি সে জন্যে তাঁদের দেওয়া এ সংজ্ঞার আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই।

কোনো কোনো ধ্বনিবিদ 'ল' কে তরল ধ্বনি (weak sound) নামে অভি-হিত করতে চান। জিভের ডগা এবং দাঁতের গোড়া তথা এদের উচ্চারক দুটোর স্বল্প-

ল তম প্রয়াসে এর ধ্বনিগত রূপ ফুটে ওঠে বলে 'ল'র তরল ধ্বনি নাম-করণ বোধ হয় খুব অযৌক্তিক নয়। তাহলে এর ধ্বনিগত নাম কি হতে পারে ? ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক ধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-lateral sound) না তরলধ্বনি (weak sound) ? ধ্বনিটি যে পার্শ্বোত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘোষতা ও স্বল্পপ্রাণতার মতো তারল্যও বোধহয় এর একটি গুণগত দিক। সুতরাং ওর সে ধ্বনিগুণ অস্বীকার করি কি করে ?

ধ্বনির গুণগত দিক থেকে বাংলা 'ল' স্বল্পপ্রাণ ঘোষ। অনেকের কাছে আশ্চর্য ঠেকলেও একথা সত্য যে তার একটি মহাপ্রাণ রূপও আছে। বাংলা হরফে 'হ' এর সঙ্গে 'ল' যোগ করে এটি লেখা হয় দেখে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় না।

হ্ল(ল্‌হ) ছেলেবেলা থেকে আমরা 'হ'য়ে 'ল'য়ে যুক্ত কিংবা 'হ'য়ে ল ফলা শিখে আসি দেখে এই সংযুক্ত বর্ণটি আমাদের মনে একটি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিরই রেখাপাত করে। 'খ' 'ছ' প্রভৃতি হরফের মতো 'ল' এর মহাপ্রাণ ধ্বনিজ্ঞাপক স্বতন্ত্র কোনো হরফ নেই দেখে এর যথার্থ ধ্বনিমূল্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না। 'হ'য়ে 'ল' ফলার নানা বিকৃত উচ্চারণই আমরা করি, শিখি এবং শেখাই। 'হ্ন' এবং 'হ্ম' যেমন মহাপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি তেমনি 'হ্ল' (ল্‌হ)ও 'ল' এর মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ এবং 'ঘ' 'ঝ' 'ঢ' 'ধ' 'ভ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো এক প্রশ্বাসজাত (one breath articulation) ধ্বনিই। 'হ্লাদ', 'আহ্‌লাদ', 'হ্লাদিনী, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দে বাংলায় এর সীমিত ব্যবহার এ ধ্বনিটির স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বর্তমান উচ্চারণবিকৃতির যুগে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এর নির্ভুল

উচ্চারণ পাওয়াও দুষ্কর। পূর্ব বাংলায় এবং পশ্চিম বাংলারও অঞ্চল বিশেষে শব্দের শুরুতে এর মহাপ্রাণতা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে আর শব্দের মধ্যে এ মহাপ্রাণতা হারিয়ে দ্বিত্ব রূপ লাভ করেছে। ফলে 'হ্লাদিনী' শব্দের উচ্চারণ শুনি 'লাদিনী' আর আর 'আহ্লাদ' পরিণত হয় 'আল্লাদ' এ। 'ল' উচ্চারণের জন্যে জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করিয়ে বাতাসের অতিরিক্ত চাপ দিলেই যে 'ল্হ' এর যথার্থ উচ্চারণ পাওয়া যায় সে কথা এ ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখি না।

স্বল্পপ্রাণ 'ল' এর মতো মহাপ্রাণ 'হ্ল' (ল্হ)ও নিনাদিত বা ঘোষধ্বনি।

ইংরেজিতে মূলধ্বনি (Phoneme) 'l' এর গুণগত দিক থেকে দুটো সদস্য রয়েছে। একটি স্বচ্ছ (clear) আর একটি গভীর (dark) ব্যঞ্জনাজাত। স্বচ্ছটি মূলধ্বনির সামিল অন্য কথায় মূলধ্বনি থেকে অভিন্ন এবং ধ্বনির আপাত সাদৃশ্যগত দিক দিয়ে বাংলার 'ল' থেকেও অভিন্ন। ইংরেজিতে শব্দের গোড়াতে ও মধ্যে স্বচ্ছ 'l' এবং শব্দশেষে সুগভীর ব্যঞ্জনাজাত (dark) 'l' ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে

ইংরেজী clear & dark l

কোন্‌টা স্বচ্ছ এবং কোন্‌টা গভীর ব্যঞ্জনাজাত 'l' তা বোঝা যায় তাদের উচ্চারণরীতির পার্থক্যজনিত দ্যোতনাগত পার্থক্য থেকে। স্বচ্ছ 'l' এর উচ্চারণে জিভের ডগা দাঁতের গোড়ার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হলে তালু এবং জিভের মাঝখানে মুখবিবরে খুব বেশী ফাঁক থাকে না। ফলে বাতাস খুব বেশী খেলতে পায় না, ধ্বনিটি একটি পরিষ্কার স্পন্দন তুলে বের হয়ে যায়। কিন্তু dark 'l' এর বেলায় জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় সন্নিবিষ্ট হতে না হতেই উক্ত অবস্থায় জিভের পাতা ও মধ্যজিভ বেঁকে গিয়ে ধনুকের মতো আকৃতি ধারণ করে। এতে বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে আবর্তিত হবার সুযোগ পায় বলে ধ্বনিটির অনুরণন গম্ভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। (তুলনীয় like, late এবং all, fall প্রভৃতি শব্দ)।

বাংলার মূলধ্বনি (phoneme) 'ল' র আরও দুটি সদস্য আছে। একটি দন্ত্য-'ল' আর অন্যটি মূর্ধণ্য 'ল'। ত বর্গীয় ধ্বনি 'ত' 'দ'-এর পূর্বে দন্তমূলীয় 'ল' দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হয়। আল্‌তা, পল্‌তে, সল্‌তে, গল্‌দা প্রভৃতি শব্দে 'ল' দন্ত্যধ্বনির পূর্বে আসে বলে তাদের সহজাত (homorganic) উচ্চারণ লাভ করে কিন্তু মৌলিক দন্ত্য-মূলীয় 'ল' এর সঙ্গে তার ধ্বনির দ্যোতনাগত কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

'উল্টা' 'পাল্টা' প্রভৃতি শব্দে 'ট' বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে 'ল' এখানে 'ট' এর সহজাত (homorganic) ব্যঞ্জনা লাভ করে। মৌলিক 'ল' এর তুলনায় 'ট' এর পূর্ববর্তী 'ল' এর যে পার্থক্য তা অনেকটা ধ্বনির অনুরণনগত। ট বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণে দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা কিছুটা দুমড়ে যায় বলে এ ধ্বনিগুলোতে আমরা অপেক্ষা-কৃত গাঢ় ব্যঞ্জনার স্বাদ পাই। 'ল' এর জন্যে দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা লেগে থাকতে থাকতেই 'ট' সেখানে গড়ে ওঠে দেখে জিভের ডগা আগে থাকতেই দুমড়ে যায়। ফলে 'ট' ধ্বনির ব্যঞ্জনা 'ল'তেও সংক্রামিত হয়। এ কারণে মূল 'ল' থেকে স্বতন্ত্র একটি দন্ত্য 'ল' আর একটি মূর্ধণ্য 'ল' এর সাক্ষাৎ আমরা বাংলা ধ্বনিতে পাই। এ ধ্বনি দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার কোনো প্রতিলিপি বাংলায় নেই। তার প্রয়োজনও আমরা অনুভব করি না। সে প্রয়োজন আমরা অনুভব করি বা না করি কিংবা তাদের জন্যে স্বতন্ত্র হরফ থাক বা না থাক সেটা বড়ো প্রশ্ন নয়। ধ্বনির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণগত দিক থেকে বিচার করলে মূল 'ল' এর এ দুটো সহধ্বনির (allophone) অস্তিত্ব স্বীকার না করে আমাদের উপায় থাকে না। বাংলা ভাষায় ত বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্ত্য 'ল' এবং ট বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূর্ধণ্য 'ল' এর সীমিত ব্যবহারই এদেরকে মূল 'ল' এর সহধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দন্ত্য ও দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য 'ল'

কম্পনজাত ধ্বনি
(Trill souud)

ধ্বনিগঠনের প্রকৃতির দিক থেকে বাংলার 'ল' এর মতো 'র' হরফ চিহ্নিত ধ্বনিটিও অনেকের কাছে তরল ধ্বনি (liquid, weak) নামে পরিচিত। এর কারণ অন্য কিছু নয়। জিভের ডগা কিংবা ডগাসংলগ্ন পাতা দাঁতের গোড়ায় লাগাতে না লাগাতেই যেমন 'ল' ধ্বনির উচ্চারণ পাওয়া যায় তার জন্যে উচ্চারক দুটোর মাংসপেশীর সবল সঞ্চালনের কোনো প্রয়োজন হয় না, 'র' উচ্চারণেও অনেকটা সে রকমই হয়। এটুকু আপাত সাদৃশ্য ছাড়া ধ্বনিগত কিংবা রূপগত অন্য কোনো সাদৃশ্য তাদের মধ্যে নেই। তাদের উচ্চারণপদ্ধতি তাদেরকে স্বতন্ত্র ধ্বনি ও রূপের অধিকারী করেছে।

জিভের ডগাকে উপর পাটি দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করিয়ে 'র' উচ্চারণ করা হয়। এদের একবারের স্পর্শেই 'র' ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে পারে। এ রকমভাবে 'র' ধ্বনিটি গঠিত হলে তাকে আমরা tap sound বলতে পারি, trill বা rolled নয়। জিভের ডগার সাহায্যে দাঁতের গোড়ায় এমনি করে বারবার আঘাত করে কাঁপুনির সৃষ্টি করলে তখন আর tap থাকে না trill তথা rolled বা কম্পনজাত ধ্বনিতে পরিণত হয়। জিভের ডগার একাধিক-বার আঘাতের ফলে বাংলার 'র' ধ্বনিটি গঠিত হয় বলে বাংলায় এটি কম্পনজাত ধ্বনিই। বাংলার 'র' এর সঙ্গে ইংরেজি 'r' এর এখানেই তফাৎ। ইংরেজি 'r' অনুরূপভাবে হয় একেবারের স্পর্শজাত, নয়তো 'very', 'sorry', প্রভৃতি শব্দে উভয় স্বরধ্বনির মাঝখানে আঞ্চলিক উচ্চারণে নিছক স্বরধ্বনির মতো প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি। স্কটল্যাণ্ডে অবশ্য বাংলার চেয়েও অনেক বেশী প্রকম্পিত (rolled)। ইংরেজিতে যে কোনো রকমের উচ্চারণই এর হোক না কেন, এটি ঘোষধ্বনিই।

র

বাংলায় একেতো জিভের ডগার কাঁপুনিতে এ ধ্বনির সৃষ্টি তার ওপরে আছে এর সৃজনকালে স্বরতন্ত্রীর কাঁপুনি। এ দুই কাঁপুনিতে মিলে ধ্বনিটিতে একটি মধুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। জিভের ডগার এ ধরণের কাঁপুনিজাত বলেই এর ধ্বনিমাহাত্ম্যে শিশুরা সহজভাবেই আকৃষ্ট হয়। তখন দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা চালনা করে র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌ রকমের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে এ ধ্বনিটিকে ধরে রাখতে কোন্ শিশু না অভিলাষী হয় তাই ভাবি। ভালো করে কবিতা আবৃত্তি করতে পারলে 'র' ধ্বনির কাঁপুনিগত প্রলম্বিত (continuant) রূপ পাঠক ও শ্রোতার জিভ ও মনকে এজন্যে সহজে আবিষ্ট করে।

'র' এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় কম্পনজাত (voiced unaspirated alveolo trill sound) ধ্বনি। ত বর্গীয় ধ্বনি 'ত', 'থ', 'দ' ও 'ধ, এর পূর্বে এ মূলধ্বনিটিও অনেকটা দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হয়। ভর্তা, শর্ত, স্বার্থ, মর্দা, গর্দভ প্রভৃতি শব্দে 'র' এর উচ্চারণ দন্তমূলীয় ততটা নয়, যতটা দন্ত্য। এ পরিবেশের দন্ত্য 'র' তাই বলে মূল দন্তমূলীয় 'র' থেকে ধ্বনি হিসাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, তার অন্তর ধ্বনি (allophone) ই।

দন্ত্য র

‘ল’, ‘ন’ এবং ‘ম’ এর মতো এরও একটা মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপ রয়েছে। আমরা যথার্থ উচ্চারণ করতে পারি বা না পারি ‘হ্রদ’, ‘হ্রেষা’, ‘হৃদয়’ ‘আহৃত’, ‘বর্হ’ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দে আমরা যে ধ্বনিটির সঙ্গে পরিচিত হই সেটি মহাপ্রাণ ‘র’ তথা র্‌হ (rh) ই। আমরা ‘হ্র’ কিংবা ‘র্হ’ যা ই লিখি না কেন, ‘খ’, ‘ছ’, ‘ঠ’, ‘থ’, ‘ফ’ প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনির মতো এটিও নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত (one breath articulation) মহাপ্রাণ ‘র’ (র্‌হ) ই। এতে একার যোগ করলে হয় ‘হ্রে’-(হ্রেষা, rhesa), আকার দিলে হয় ‘হ্রা’-(হ্রাস, rhas), ইকার দিলে হয় ‘হৃ’- (হৃদয়, rhiday ; আহৃত, arhito) আর অন্য কোন স্বরধ্বনি এতে যোগ না করলে অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো সহজাত ‘অ’ স্বরধ্বনিটি নিয়ে এটি লিখিত ও উচ্চারিত হয় ‘হ্র’-(হ্রদ, ‘rhad’) এবং ‘র্হ’ (বর্হ, barrho) রূপে।

ধ্বনিটির লিখিত রূপ এবং লেখা ও শেখানোর পদ্ধতি এর নানা ভ্রান্ত উচ্চারণের কারণ হয়েছে। সাধারণতঃ ‘হ’য়ে ‘র’ ফলা ‘হ্র’ এবং ‘হ’য়ে ঋকার ‘হৃ’ই ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়ে থাকে। সে জন্য এর যথার্থ উচ্চারণ সহসা আমাদের আয়ত্তে আসে না। আমরা প্রায়ই মনে করি এটি বুঝি যুক্তধ্বনি। তাই আমরা ‘হ্রদ’কে পড়ি ‘হরদ’। কেউ কেউ বা ‘রহদ’ও পড়েন। তাঁদের মুখে হৃদয় হয়ে যায় ‘হিরিদয়’। (রূপ প্রভৃতি শব্দের ‘রূ’ এর সাদৃশ্যে ‘হৃদয়’ কেন যে ‘হূদয়’ পঠিত হয় না, তাই ভেবে বিস্মিত হই)।

হ্র, হৃ, হ্রা, র্হ

একালে মহাপ্রাণ ‘ল’, ‘ন’, ‘ম’ এর মতো মহাপ্রাণ ‘র’ ও অবশ্য তার মহাপ্রাণতা হারাচ্ছে। সেকথা অবশ্য স্বতন্ত্র। অন্যান্য ধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপের দিক থেকে পূর্ব বাংলা অগ্রণী হলেও এ ধ্বনি কটির মহাপ্রাণতা লোপের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলাও পেছনে পড়ে নেই। তাই ‘হ্রদ’, ‘হৃদয়’, ‘বর্হ’, প্রভৃতি শব্দ উভয় বাংলাতেই আমরা ‘রদ’ ‘রিদয়’ এবং ‘বর’ রূপে শুধু উচ্চারিতই হতে শুনি না, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বুড়ো আংলা’য় ‘হৃদয়’কে ‘রিদয়’ রূপে লিখিতও দেখি।

আগেই বলেছি স্বল্পপ্রাণ ‘র’ এর ধ্বনিমাধুর্য স্বভাবতই মনকে আকৃষ্ট করে। ‘হ্রদ’ প্রভৃতি শব্দের গোড়াতে ‘হ্র’-‘হৃ’-‘হ্রা’—এবং ‘বর্হ’, ‘আহৃত’ প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে ‘র্র্হ’, ‘রি্হ’ রূপে ‘র’ এর যথার্থ মহাপ্রাণ উচ্চারণে প্রাণবায়ুর অতিরিক্ত

ধাক্কায় মন যে কম আলোড়িত হয় তা নয়। কবিতায়, গানে এর মহাপ্রাণজাত প্রকম্পন হৃদয়ে এক অভাবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করে।

উষ্ম বা শিসজাত ধ্বনি
(Fricative sound)

বাংলা বর্ণমালায় অন্যান্য হরফের সঙ্গে 'শ', 'ষ', 'স' এবং 'হ' এ চারটি হরফ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমটির নাম 'তালব্য শ', দ্বিতীয়টির নাম 'মূর্ধণ্য ষ' আর তৃতীয়টির নাম 'দন্ত্য স'। এদের নাম অনুসারে প্রথমটি তালু থেকে, দ্বিতীয়টি মূর্ধা থেকে এবং তৃতীয়টি দাঁত থেকে উচ্চারিত হওয়া উচিত। সংস্কৃতে এগুলোর এ ধরণের উচ্চারণ ছিলো বলেই সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এদের এ নামকরণ করেছিলেন। প্রাচীনকালে সম্ভবত বাংলাতেও এরকম উচ্চারণ ছিলো। এ হরফগুলোর নাম অনুযায়ী উচ্চারণ একালের বাংলায় না থাকলেও প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে অন্যান্য হরফের বেলায় যেমন এগুলোর বেলাতেও তেমনি গতানুগতিক নামেরই অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে আমরা যে এ হরফগুলোর সব কয়টিরই বিড়ম্বনা ভোগ করছি তা নয়, এদের স্বতন্ত্র ধ্বনিগত উল্লেখযোগ্য কোনো বৈষম্য না থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এদের জের টেনে যাচ্ছি। এতে ছেলে বুড়ো কারুরই কম দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে না।

'আঁষ' (মাছের আঁষ), 'আমিষ', 'আশা', 'আসা', 'আসন', 'সে' প্রভৃতি শব্দে লিখিত শিসধ্বনিবাচক বিভিন্ন হরফগুলোর একটি উচ্চারণই আমরা করে থাকি। উক্ত উচ্চারণকে 'শ' হরফটির সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে একই ধ্বনির অপরিবর্তনীয় উচ্চারণ উক্ত ধ্বনিটিকে ভাষার মূল ধ্বনিগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। সেদিক থেকে 'শ'ই বাংলার শিসজাতীয় মূলধ্বনি (phoneme)।

পশ্চাৎদন্তমূলীয় মূলধ্বনি 'শ'

এ ধ্বনিটির উচ্চারণে ওপর পাটি দাঁতের গোড়ার শেষভাগে অর্থাৎ পশ্চাৎ দন্তমূলে জিভের সম্মুখভাগ উঁচু করে বায়ুপথ সংকীর্ণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে লম্বালম্বি-ভাবে জিভের দুপাশ ওপরের দুচোয়ালের দাঁতের গায়ে ঘেঁষে যায় আর জিভের

সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের মাঝামাঝি অংশটি সঙ্কুচিত হয়ে একটি খাদের সৃষ্টি করে। ফুস্‌ফুস্‌ তাড়িত বাতাস সে খাদ বেয়ে বেরুতে গিয়ে পশ্চাৎ দন্তমূলে যেখানে বায়ুপথ সঙ্কীর্ণতম হয়েছে সেখানে চাপা খেয়ে এ শিসজাত ধ্বনিটির সৃষ্টি করে। ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়ার সময় কিংবা শ্বাস ছাড়ার সময় 'শ্‌শ্‌শ্‌'-'শ্‌শ্‌শ্‌' জাতীয় আমরা যে আওয়াজ শুনি সেই হিশ্‌ হিশ্‌ ধ্বনির সঙ্গে এর আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। এর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীতে কোন কাঁপুনি অনুভূত হয়না। সেজন্যে ধ্বনিটি নিনাদিত নয় বরঞ্চ অঘোষ। এর ধ্বনিগত নাম তাই অঘোষ স্বল্পপ্রাণ পশ্চাৎদন্ত-মূলীয় উষ্ম তথা শিসধ্বনি (voiceless unaspirated post dental fricative, sibilant বা spirant sound) কোনক্রমেই তালব্য নয়। একমাত্র 'শ' চিহ্নটির সাহায্যেই আমরা এ ধ্বনিটিকে যথাযথ ভাবে ধরে রাখতে পারি। শ্বাস বা প্রাণবায়ু-জাত ধ্বনি বলে নাসিক্য, পার্শ্বিক ও কম্পনজাত ধ্বনির মতো এটিও প্রলম্বিত ধ্বনি। যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণই ধ্বনিগঠনকালে এটিকে ধরে রাখা যায়। বাঙালী শিশুরা মুখের মধ্যে যে সব প্রলম্বিত ধ্বনি সৃষ্টি করে আনন্দ পায় আর খেলা করতে ভালো-বাসে এ ধ্বনিটি তাদের মধ্যে একটি।

Phoneme বা ধ্বনিমূলের দিক থেকে বাংলার পশ্চাৎদন্তমূলীয় এ 'শ' ধ্বনিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দন্তমূলীয় 'ন'এর কয়েকটি অন্তর ধ্বনির (allophone) মতো 'শ'এরও কয়েকটি অন্তর ধ্বনি দেখা যায়। তাদের প্রত্যেকটিই বিশেষ একটি পরিবেশে উচ্চারিত হয় অন্যত্র নয়। হরফ চিহ্নিত দন্ত্য 'স' মূর্ধণ্য 'ষ' এবং চিহ্নবিহীন অগ্রদন্তমূলীয় 'শ' এ মূলধ্বনিটির অন্তর ধ্বনির পর্যায়ে পড়ে। ত বর্গীয় ধ্বনি 'ত' ও 'থ' এর পূর্বে এ ধ্বনিটির যথার্থ দন্ত্যরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বস্তা, বস্তি, আস্থা, অস্থি, প্রভৃতি শব্দে দন্ত্য ত এর পূর্ববর্তী ধ্বনি হিসেবে 'স' ও এখানে যথার্থ দন্ত্য ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এ ছাড়া বাংলায় 'স'এর দন্ত্য উচ্চারণ আমরা অন্য কোথাও পাই না। আস্থা, বস্তি, বস্তা, আস্তে প্রভৃতি শব্দ

দন্ত্য স উচ্চারণের সীমিত পরিবেশ : 'স' ও 'শ'র সহধ্বনি

আমরা 'শ' দিয়ে আশ্‌থা বশ্‌তি, বশ্‌তা, আশ্‌তে লিখলেও উচ্চারক তার নিজের অজ্ঞাতসারে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই এর সহজাত (homorganic) উচ্চারণই করবে। বাংলার তথাকথিত দন্ত্য 'স'এর এ সীমিত উচ্চারণই একে মূলধ্বনির পর্যায় থেকে

অপসারিত করে 'শ'এর দন্ত্য অন্তর ধ্বনি (allophone) হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

বাংলায় 'র', 'ল' ও 'ন' চিহ্নিত ধ্বনি তিনটি যে পুরোপুরি দন্তমূলীয় আমি সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। বাংলায় আমরা শ্রাবণ, শ্রী, শ্রীময়, শ্রীমতী, বিশ্রী, শ্লীল, শ্লীলতা এবং স্নান, স্নেহ, স্নেহময়, স্নেহাস্পদ প্রভৃতি শব্দে (শ্+র), (শ্+ল) এবং (স্+ন) এর যোগ দেখি। এসব ক্ষেত্রে 'শ' এবং 'স' এর ধ্বনিগত রূপে তেমন কোনো স্থূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি? 'ত' ও 'থ' এর পূর্বে 'স'এর (বাস্তব, বস্তু প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়) পুরোদস্তুর দন্ত্য উচ্চারণের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই কিন্তু 'র', 'ল' এবং 'ন' এর পূর্বে (শ্র, শ্ল এবং স্ন সংযোগে) ধ্বনিগত দিক থেকে 'শ' এবং 'স' এর একরকম ঘনিষ্ঠ মিল দেখি। এসব ক্ষেত্রে 'শ' ও 'স' পুরোদস্তুর দন্ত্যও নয় পশ্চাৎদন্তমূলীয় কিংবা যথাযথ দন্তমূলীয়ও নয়; ধ্বনির সূক্ষ্মতম বিচারে অগ্রদন্ত-মূলীয়। 'র', 'ল' এবং 'ন' এর আগে 'শ' ও 'স' এর সংযোগজাত ধ্বনি ওপরের বড় দু দাঁতের শেষ এবং দাঁতের মাড়ির উত্তল (convex) অংশের মাঝামাঝি থেকে উচ্চারিত হয়। সে জন্যে এ তিনটির সংযোগপূর্ব অবস্থায় 'শ' এবং 'স' হরফ দুটোর যে ধ্বনি পাওয়া যায় তা Pre-alveolar বা অগ্রদন্তমূলীয় এবং মূল 'শ' ধ্বনির একটি অন্তর ধ্বনিই। বাংলা লেখন পদ্ধতি যেহেতু চরমতম (absolute) ধ্বনিমূলক নয়, বরঞ্চ প্রশস্ত লেখন পদ্ধতি (broad transcription) অনুসারে প্রধানত ধ্বনিমূলক (phonemic) সেজন্যে 'শ' এবং 'স' এর পরিবর্তে এসব ক্ষেত্রে একমাত্র 'শ'ই ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রী, শ্রাবণ প্রভৃতি শব্দে যদি 'শ' এর অগ্রদন্তমূলীয় ধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে* তাহলে বশ্তু, বাশ্তব, আশ্থা লিখলেও চোখে যেমন ঠেকে না কেন, আমাদের অজ্ঞাতসারে ওর অন্তর্নিহিত দন্ত্যধ্বনিটি নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই আমরা পেয়ে যাবো।

'শ'এর অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি

* কিছুকাল যাবৎ পশ্চিম বাংলার অঞ্চল বিশেষের (বিশেষ করে কলকাতার) আধুনিক বাবুরা ফ্যাসান হিসেবে শ্রী, শ্রীমতী প্রভৃতি স্থানে 'শ্র'র পশ্চাৎদন্তমূলীয় উচ্চারণ করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাতে 'শ্রী' (Shri) উচ্চারণ মাঝেমাঝে শুনতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটি এর যথার্থ উচ্চারণ নয়। এর যথার্থ উচ্চারণ শ্রী (Sri) ই।

'ষ' হরফটিকে মূর্ধণ্য ষ বলা হয়। এর প্রচলিত নাম অনুসারে মূর্ধাজাত এর খাঁটি অনুরণন পাওয়া উচিত। কিন্তু ট বর্গীয় ধ্বনিগুলোর আলোচনায় আমি দেখিয়েছি যথার্থ মূর্ধাজাত কোন ধ্বনি বাংলায় নেই। 'ট' 'ঠ' 'ড' 'ঢ' চিহ্নিত যে সব ধ্বনি আমরা পাই তা উচ্চারণের স্থান অনুসারে দন্তমূলীয়ই কিন্তু জিভের ডগার মোচড়জনিত প্রতিবেষ্টিত অনুরণন ধ্বনিগুলোকে আমাদের কানে দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। 'শ' ই যে বাংলার একমাত্র পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় উষ্ম তথা শিসধ্বনি, তা আমরা আগেই দেখেছি। ট বর্গীয় ধ্বনি 'ট' ও 'ঠ' এর পূর্বে বেষ্টন, বেষ্টিত, খৃষ্ট, কাষ্ঠ, কোষ্ঠ প্রভৃতি শব্দে যে 'ষ' ধ্বনির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই সেটি এ মূল পশ্চাৎদন্তমূলীয় ধ্বনিরই এ পরিবেশজনিত একটি বিশেষ অনুরণন—দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত তথা দন্ত-মূলীয় মূর্ধণ্য 'ষ'। 'ট' ও 'ঠ' এর পূর্বের এ পরিবেশ ছাড়া 'ষ' এর উচ্চারণ বাংলায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সেই জন্যেই 'ষ'ও মূলধ্বনি 'শ'এরই একটি সহধ্বনি। একে এ পরিবেশে যে কোনো হরফ চিহ্নিত করা হোক না কেন বাঙালী তার অজ্ঞাতসারে এ পরিবেশজাত উচ্চারণই করবে। সে জন্যে 'ট' 'ঠ' এর পূর্বে 'ষ' না লিখে নিতান্ত ধ্বনিগত দিক থেকে 'শ্ট' 'শ্ঠ' সহজেই লেখা যায়।

'শ'এর দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য সহধ্বনি 'ষ'

'শ' স্বল্পপ্রাণ এবং অঘোষ। এর কোনো মহাপ্রাণ প্রতিরূপ নেই। এমনকি যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপও বাংলায় নেই। ইংরেজিতে pleasure, measure প্রভৃতি শব্দে এবং garage এর যথার্থ ফরাসী উচ্চারণে 'zh' জাতীয় যে ঘোষধ্বনি শোনা যায়, তা-ই বাংলার 'শ' ধ্বনিটির যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপ। আরবী, পার্শী ও ইংরেজী ভাষার 'রোযা' 'নামায' 'যাকাত' 'বাযার' প্রভৃতি শব্দে আমরা 'z' জাতীয় যে ঘোষধ্বনিটি উচ্চারণ করি তা 'শ' এর যথার্থ ঘোষবৎ প্রতিরূপ নয়। এ সব শব্দের এ শিসধ্বনিটি যথার্থ দন্তমূলীয়—এর গতি বরঞ্চ কিছুটা অগ্রদন্তমূলীয় হতে পারে কিন্তু পশ্চাৎদন্তমূলীয় নয়। এ ঘোষধ্বনিটি খাঁটি বাংলা ধ্বনি নয়, আরবী ও পারসী ভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানে কিছুকাল যাবৎ এটিকে 'য' চিহ্নিত করে লেখার প্রয়াস চলছে। এর ধ্বনিগত নাম ঘোষ স্বল্পপ্রাণ দন্ত-মূলীয় শিস তথা উষ্মধ্বনি (voiced unaspirated alveolo-fricative sound)।

ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা 'হ' নিয়ে যত হতভম্ব হয়েছেন এমন আর অন্য কোনো ধ্বনি নিয়ে নয়। এ ধ্বনিটির উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এর যথার্থ স্বরূপ ও নামকরণ সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এ বিতর্ক শুধু বাংলা ভাষার 'হ' ধ্বনিটি নিয়ে নয়, বহু ভাষার 'হ' সম্পর্কে এ কথা সত্য। কেউ বলেন এটি একটি স্বরধ্বনিই তবে এর সঙ্গে নিঃসৃত বাতাসের গতির চাপ একে মহাপ্রাণ করে তুলেছে। কেউ বলেন এটি উষ্মধ্বনিই তবে ঘোষ। কেউ বলেন এটি অঘোষ উষ্মধ্বনি। কেউ বলেন এটি অন্যান্য মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলোর অংশবিশেষ (component) আর কেউ বলেন এটি নিছক স্পর্শহীন মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি।

হ

এ মতগুলোর আলোচনা করা যাক।

স্বরযন্ত্রের (larynx) মধ্যে যে দুটো স্বরতন্ত্রী (vocal cords) পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ওপর থেকে নীচের দিকে কিংবা নীচ থেকে উপরের দিকে চলে গেছে আমাদের বিশ্রাম মুহূর্তে সে দুটোর একটি আর একটির ওপরে চেপে যায় না কিংবা গায়ে গায়ে লেগেও থাকে না, থাকে নিষ্ক্রিয়। দুটোর মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে। বিশ্রাম মুহূর্তে এ ফাঁক (glottis) টুকুর ভেতর দিয়ে অবাধে বাতাস বের হয়ে যায়। কিন্তু কথা বলতে গেলেই স্বরতন্ত্রী দুটো নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কখনও তাদের কাঁপুনি হয় তীব্র, কখনও মৃদু। তাদের কাঁপুনির দ্রুততা স্বরযন্ত্রের মধ্যে একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে। মুখবিবর ও ঠোঁটের যে কোন জায়গায় ধ্বনিগঠন-কালে স্বরযন্ত্রের এ কাঁপুনি অক্ষুণ্ণ থাকলে সে সব ধ্বনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে ঘোষতা গুণ মূর্ত হয়ে ওঠে। আর ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলে ধ্বনিগুলো হয় অঘোষ। আমরা আগেই দেখেছি বাংলার যাবতীয় স্বরধ্বনিই ঘোষ। মুখবিবরে সম্মুখ কি পশ্চাৎভাগ যেখান থেকেই তারা উচ্চারিত হোক না কেন, তাদের উচ্চারণকালে স্বরতন্ত্রীর, এ প্রকম্পন অব্যাহত থাকে। যাঁরা 'হ'কে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলতে চান তাঁদের যুক্তি হলো এই যে, 'হ' গলনালীর স্বরযন্ত্র থেকেই উচ্চারিত হয় আর তার উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী (vocal cords) দুটো রীতিমতো কেঁপে যায়। ধ্বনিটি নির্গত হবার কালে বাতাসের চাপ কিছু বেশী হলেও স্বরধ্বনির গুণ এতে ক্ষুণ্ণ হয় না। সুতরাং সাধারণ স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা

'হ' কি মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি ?

একে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলে দাবী করেন।

এর আগে আমরা স্বরধ্বনির যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছি তাতে দেখা যায় ফুস্‌-ফুস্‌-তাড়িত বাতাস গলনালী কি মুখবিবর দিয়ে প্রবাহিত হতে গিয়ে কোথাও বাধা-প্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপাও না খেয়ে যেসব ধ্বনি উত্থিত হয় তাই স্বরধ্বনি। উচ্চারক দুটো খুব কাছাকাছি আসার জন্যে সেখানে বহিরোন্মুখ বাতাসে যদি শ্রুতিগ্রাহ্য ঘর্ষণ অনুভূত হয় তাহলে আর তা স্বরধ্বনি থাকে না। উষ্ম তথা শিসধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। 'হ' ধ্বনি উচ্চারণে ফুস্‌ফুস্‌তাড়িত বাতাসের বেগ এত প্রবল হয় যে স্বরতন্ত্রীতে কাঁপুনির সৃষ্টি করে তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উভয় স্বরতন্ত্রীর মধ্যেকার সংকীর্ণ পথ ধরে বেরোতে গিয়ে দুটোর মাঝখানে তা নিপিষ্টও হয়ে যায়; ফলে যে ধ্বনিটি উৎপন্ন হয় তা আর নিছক স্বরধ্বনি থাকে না উষ্ম বা শিষধ্বনিরই আভাস দিয়ে যায়। এ কারণেই যাঁরা এ ধ্বনিটিকে মহাপ্রাণ স্বরধ্বনি বলেন তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। গঠন (production) এবং শ্রুতির (acoustics) দিক থেকে 'হ' যে মহাপ্রাণ ঘোষ উষ্মধ্বনিই গভীরভাবে অনুধাবন করলে শেষ পর্যন্ত তা অনুভব করা যায়।

বাংলায় আমরা যে 'হ'র সঙ্গে পরিচিত হই তা মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনিই, অঘোষ নয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো ভাষাতে 'হ'র দুটো রূপ দেখা যায়। একটি ঘোষ আর একটি অঘোষ। সেসব ভাষায় 'হ'র ঘোষতা ও অঘোষতাজনিত বৈপরীত্য (minimal contrast) শুধু ধ্বনিগত পার্থক্যই সৃষ্টি করে না, অর্থগত দিক থেকে দুটো স্বতন্ত্র শব্দেরও সৃষ্টি করে। ইংরেজীতে মূলধ্বনি হিসেবে 'h' অঘোষই। এর বিপরীত কোনো ঘোষধ্বনি নেই। তবে শব্দের ভেতরে ক্ষেত্রবিশেষে ঘোষ হতে পারে। ইংরেজি 'hit' 'hut' 'hat' প্রভৃতি শব্দের 'h' অঘোষ কিন্তু 'behind' জাতীয় শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'h' ঘোষই

'হ' ঘোষ না অঘোষ?

এরকম ক্ষেত্রে ঘোষ 'h'—মূলধ্বনি অঘোষ 'h'এর অন্তরধ্বনি (allophone) বলেই গণ্য হবে। কোন একটি ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে অন্য একটি ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনির আপাত মিল থাকলেও ধ্বনির প্রকৃতিবিচার একটি ভাষার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যেই

করতে হবে, অন্য ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করে নয়। এদিক থেকে বাংলা 'হ'র সঙ্গে ইংরেজী, উর্দু, আরবী (ح) এবং অন্যান্য ভাষার 'h' জাতীয় ধ্বনির আপাত মিল দেখে তাদের সঙ্গে তুলনায় তার ধ্বনিগুণ যেন আমরা বিচার না করি। বাংলার 'হ' ঘোষধ্বনিই, অঘোষ নয়। বাক্যের অবিরল ধ্বনিস্রোতের মধ্যে শব্দের শুরুতে কিংবা অন্ত্যে হয়তো এর ঘোষত্তাগুণ উচ্চারণের ওপর নির্ভর করে আংশিক কমে আসতে পারে। ধ্বনির অবস্থা ও উচ্চারণ অনুসারে ঘোষতাগুণের পরিমাণগত হ্রাসবৃদ্ধি গবেষণাসাপেক্ষ।

দু একটি ক্ষেত্রে 'হ' এর অঘোষ রূপ অবশ্য আমরা বাংলাতেও দেখি। যন্ত্রনায় অধীর হয়ে, শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে কিংবা গভীর আনন্দে উল্লসিত হয়ে আঃ! ওঃ! উঃ! ইঃ! প্রভৃতি অব্যয়গুলোর যথার্থ উচ্চারণকালে বিস্ময় প্রকাশ করলে ফুস্‌ফুস্‌তাড়িত বাতাসের গতি মনে হয় গলনালীতে যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে—প্রাণবায়ুর অন্ত্যহীন মহাপ্রাণ চাপ অবাধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত হচ্ছে না। ফলে 'হ' র যে স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর অনুরণন তাও ধ্বনিত হচ্ছে না। এ ধ্বনিটির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী ফাঁকের (glottis) ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে অনুভূতি-যোগ্য কোনো কাঁপুনির সৃষ্টি না করে বাতাস বেরিয়ে যায়। সেজন্যে তাদের ব্যঞ্জনা গাঢ় হয় না। এ ধরণের অব্যয়গুলোতে বিসর্গ চিহ্নিত বাংলা হরফের যে ধ্বনি আমরা পাই, তা বিসর্গের নয়, মহাপ্রাণ অঘোষ 'হ' এরই। এ ধ্বনিকে রূপায়িত করার জন্যে বাংলায় বিসর্গ ছাড়া অন্য কোন প্রতীক নেই। এ অঘোষ 'হ' বা বিসর্গকে (ঃ) আমরা মূল ঘোষ 'হ' এর অন্তরধ্বনি (allophone) ছাড়া আর কি বলতে পারি?

অঘোষতাজনিত 'হ' তথা 'ঃ' আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি। এর পূর্বাবস্থিত স্বর-ধ্বনিকে অবলম্বন করে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ফলে 'আ' র পরে এর উচ্চারণ অনেকটা পশ্চাত্তালুজাত বলে মনে হয়। তাই 'আঃ' এবং 'ওঃ'তে এর উচ্চারণ আ-খ্-খ্, ও-খ্-খ্ (ح) জাতীয় আরবী 'হ' এর মতো লাগে। 'ই'তে এর উচ্চারণ সম্মুখ তালুজাত কি পশ্চাৎদন্তমূলীয় 'শ' র মতো ই-শ্-শ্-শ্ শোনায় আর উঃ তে ওষ্ঠ্য শিসধ্বনি'ফ' জাতীয় উ-ফ-ফ-ফ্ বলে মনে হয়।

'হ' ধ্বনির মহাপ্রাণতাকে কেউ কেউ আমাদের 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ',

'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' বর্গীয় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর শেষাংশ তথা second component বলে মনে করেন। শুধু আমাদের দেশের নয় ইউরোপ আমেরিকার কোনো কোনো ধ্বনিবিদও এ ধরণের মত পোষণ করেন। আমাদের বাজারের ব্যাকরণগুলোতে 'ক্+হ=খ', 'গ্+হ=ঘ' ইত্যাদি ভাবে যেমন স্বল্পপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনির সঙ্গে নিছক মহাপ্রাণ 'হ' জুড়ে দিয়ে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় তেমনি উর্দুতে মৌলবী সাহেবরা পড়ান ک+ہ=کھ এবং রোমান লিপিতেও 'খ', 'ঘ', 'ফ', প্রভৃতি kh, gh, ph ধরণে লিখিত হয়। ক্+হ=খ, গ্+হ=ঘ, কিংবা ک+ہ=کھ কিংবা k+h=kh জাতীয় লিখন পদ্ধতি থেকেই সাধারণ মানুষের মনে, এমন কি অনেক ধ্বনিবিদের মনেও এরকম অনেক ভুল ধারণা অনেক সময় বদ্ধমূল হয়ে যায়। লেখনপদ্ধতি ধ্বনিবিচারের মাপকাঠি নয়। ধ্বনির উচ্চারণই যে ধ্বনিবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত চক্ষুগ্রাহ্য হরফের সাহায্যে ধ্বনির রূপায়ণ অনেক সময়ে পরিণত মনের ধ্বনিবিদকেও সে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

'হ' যুক্ত না অসংযুক্ত ধ্বনি

'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ', এ স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনি-গুলোকে বাংলা, উর্দু কি রোমান বর্ণমালার সাহায্যে আমরা যে ভাবেই লিখি না কেন, এদের উচ্চারণ কোনো সময়েই সংযুক্ত নয়, তারা নিশ্বাসের এক প্রচাপনে একইভাবে উত্থিত অবিভক্ত অবিভাজ্য ধ্বনি। ওদের কোনোটার মধ্যেই স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্যমান নেই। সুতরাং 'হ' এর এ ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয়ার্ধ গঠন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া বাংলা 'হ' ঘোষধ্বনিই। চলিত বাংলার 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ' এ পাঁচটি ধ্বনি অঘোষ আর 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ' 'ধ', 'ভ', 'ঢ়' ধ্বনি কটি ঘোষ। পরবর্তী ধ্বনি কটিতে ঘোষ 'হ' নাহয় তাদের দ্বিতীয়ার্ধ গঠন করলো কিন্তু পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি কটিতে কিভাবে তা করবে? ধ্বনির অঘোষতা ও ঘোষতা গুণ একত্রে কখনও একক অঘোষ ধ্বনি সৃষ্টি করে না। সুতরাং ধ্বনির গঠন ও প্রকৃতিগত দিক থেকেই 'হ' স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধ্বনি। স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর কারুর সঙ্গেই ওর কোন সম্পর্ক নেই।

সম্পূর্ণ উষ্মধ্বনির পর্যায়ে না ফেলে যাঁরা 'হ' কে স্পর্শহীন গলনালীয় নিছক

ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced aspirated without stop) বলতে চান তাঁদের কথায় বরং কিছু সত্য আছে। স্বরতন্ত্রী কি গলনালীর মধ্যে 'হ' যে কি পরিমাণ ঘর্ষণের সৃষ্টি করে তা গবেষণাসাপেক্ষ। তাঁরা এর এ ঘর্ষণজাত প্রকৃতিকে অস্বীকার না করে স্পর্শ ধ্বনিগুলোর বিপরীত এর স্পর্শহীনতা ও মহাপ্রাণতাকেই বড়ো করে দেখেন। প্রাণবায়ুর প্রবল চাপজনিত এর অবাধ মুক্ত গতি ধ্বনিটিতে একটি উদার উদাত্ত অনুরণনের সঞ্চার করে। এ ধ্বনির অপ্রমেয় প্রাণশক্তি এবং অপরূপ হাহাশ্বাসময় ব্যঞ্জনায় মন সহজেই আবিষ্ট হয়ে ওঠে।

'হ' স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি

তা হলে ধ্বনিগত দিক থেকে কোন্ নামে 'হ'কে অভিহিত করা যাবে? গলনালীয় কি স্বরতন্ত্রীজাত ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বা শিস ধ্বনি (voiced aspirated glottal fricative sound) না নিছক স্পর্শহীন গলনালীয় বা স্বরতন্ত্রীজাত ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced glottal aspirated sound without stop) ? আমি যে আলোচনা করেছি তা থেকে প্রমাণিত হবে 'হ' এর এ দুটো নামই গ্রহণযোগ্য।

'হ' এর যথার্থ সংজ্ঞা

চলিত বাংলায় 'ফ' (ph) ও 'ভ' (bh) চিহ্নিত ধ্বনি দুটো ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি। পূর্ব বাংলার অঞ্চলবিশেষে এ ধ্বনি দুটো স্পর্শ নয় বরং ইংরেজি 'f' ও 'v' এর মতো দন্ত্যোষ্ঠ শিসধ্বনি। পূর্ববাংলার এসব অঞ্চলে আমরা ফুল, ফল, ভয় প্রভৃতি শব্দে এ ধ্বনিগুলোর যে উচ্চারণ শুনতে পাই তা এ দুটোকে ইংরেজি দন্ত্যোষ্ঠ শিসধ্বনি হিসেবেই প্রতিপন্ন করে। চলিত বাংলাতেও বাক্যের ধ্বনিস্রোতের মধ্যে অসতর্ক মুহূর্তে এগুলো কোথাও কোথাও দন্ত্যোষ্ঠ শিসধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপ 'ফ' (f) এর অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্যোষ্ঠ উষ্মধ্বনি (unvoiced aspirated labirodental fricative sound) আর 'ভ' (v)কে তার বিপরীত অর্থাৎ মহাপ্রাণ ঘোষ দন্ত্যোষ্ঠ ধ্বনি (voiced aspirated labio dental fricative sound) নামে অভিহিত করা যায়।

আঞ্চলিক বাংলার 'প', 'ফ' ও 'ভ'

অসমিয়া পেটকাটা ব এর যে ধ্বনি তার সঙ্গে আরবীর و এবং বাংলার অর্ধস্বর 'w' এর সাদৃশ্য দেখি। খাওয়া, দাওয়া, হাওয়া, দোয়া, মোয়া, মেওয়া প্রভৃতি শব্দে

'ও' এবং 'য়া' র মাঝখানে 'w' জাতীয় যে ধ্বনিটি শোনা যায় তা অনেক সময় দুঠোঁটের সঙ্গে বাতাসের ছোঁয়া লেগে উৎপন্ন হয়। এ ধ্বনিটি রূপায়িত করার জন্যে বাংলাতে আজও কোনো চিহ্ন নির্নীত হয়নি। বাংলায় অন্তঃস্থ ব শুধু নামেই আছে

বাংলার অন্তঃস্থ ব,

বর্গীয় 'ব' এর সঙ্গে তার সাদৃশ্যগত কোনো তফাৎ নেই। এ ধ্বনিটিকে বাংলা হরফে চিহ্নিত করার কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও এর ধ্বনিগত আকৃতি তো নষ্ট হয় না। সুতরাং এরও একটি ধ্বনিগত নাম অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাহলে একে কি বলা যাবে? অর্ধস্বর (semivowel) না স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য শিসধ্বনি (voiced unaspirated bilabial fricative sound)? এ শ্রুতধ্বনি (glide)র গঠন ও প্রকৃতি বিচার করে যদি বোঝা যায় যে বাতাস দু ঠোঁটের মাঝে কিছু পরিমাণে পিষে গেছে কিংবা দুঠোঁটের মাঝে বাতাসের ভারটুকু স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে তখন এটা হবে শিসধ্বনিই। আর এ অনুভূতিটুকু স্পষ্ট না হলে এটা অর্ধস্বর বলেই গণ্য হবে। উচ্চারণে ঠোঁট দুটো যত বেশী গোলাকার এবং নিকটতর হবে তত বেশী করে ধরা পড়বে এর শিসজাতীয় বৈশিষ্ট্য। আর বর্তুলাকার দু ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান থাকবে যতবেশী ধ্বনি হিসেবে অর্ধস্বরের পর্যায়ে পড়ে ততই এর ঐশ্বর্য ও মাধুরী কমে আসবে।

উষ্মধ্বনির দিক থেকে বাংলার তুলনায় ইংরেজি এবং আরবী অনেক বেশী সমৃদ্ধ। ইংরেজিতে f, v, th, s, sh, z, 3, r, h এ দশটির আর আরবীতে ث ، ز ، ذ ، ظ ، ح ، ع ، غ ، ف ، س ، ص এবং ه এ তেরটির সন্ধান পাওয়া যায়।